সমবায়

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ সংখ্যা

সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা

সমবায়

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
মোঃ আহসান কবীর
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য
মোঃ জিল্লুর রহমান
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

শাকিলা হক
উপনিবন্ধক (পিপি)

মোঃ আবুল খায়ের
উপনিবন্ধক (ইপি)

সদস্য সচিব
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

মূল্য
পঁচিশ টাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মনিরুল ইসলাম

মুদ্রণ
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮সি/১, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৯১৪০৮৭৭,৮১২৯৬৫৪,৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩, ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com
ওয়েব সাইট : www.coop.gov.bd,ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

সূচিপত্র

সমবায় অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক সাফল্য ও অর্জন : ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস	৩
বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও অর্ধশতাব্দীর সমবায় আন্দোলন : ড. জাহাঙ্গীর আলম	৮
মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন : ড. মিল্টন বিশ্বাস	১২
কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সমবায় : ড. কিউ আর ইসলাম	১৬
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন : কৌশল ও আমাদের দায় : মোঃ আহসান কবীর	১৮
বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও কর্মযজ্ঞ : একটি প্রায়োগিক অনুসন্ধান : হরিদাস ঠাকুর	২০
চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় : প্রসঙ্গ সমবায় : মোঃ জিল্লুর রহমান	২৯
সমবায় সমিতির আর্থিক ব্যবস্থাপনার নানা দিক : মাঠশিক্ষা : মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন	৩১
পাহাড়ের জনপদে একটি আলোকিত নাম 'বারেং মহিলা সমবায় সমিতি' : রত্ন কান্তি রোয়াজা	৩৩
একটি সম্ভাবনাময় সমবায় সমিতির পরিক্রমা : মোঃ নাসির উদ্দীন	৩৫
আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, নওগাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা : একজন সমবায়ীর সমবায় ভ্রমণ : সিফাত-ই-নুসরাত	৩৭
৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান	৩৯
রংপুরে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২১ উদযাপন	৪২
'সুবর্ণ রেখায় বাংলাদেশ : স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের সমবায় ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় আগামী দিনের সমবায় ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার : মোঃ সাইফুল ইসলাম	৪৩
অমর একুশে বইমেলা ২০২২	৪৫
বিজয় দিবসে শপথ করালেন প্রধানমন্ত্রী	৫০
সমবায় অধিদপ্তরে জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ পালন	৫১
সমবায় অধিদপ্তরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন	৫৫
বরিশাল বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা	৫৭
বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতির উদ্বুদ্ধকরণ সভা	৫৭
যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলা পরিদর্শন	৫৮
চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা ও উপজেলা সমবায় অফিসারদের সাথে মতবিনিময় সভা	৬০
কক্সবাজারে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	৬১
'মানসম্পন্ন নিরাপদ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৬২
'ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস' বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২১ অনুষ্ঠিত	৬৩
৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৬৪

প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু মডেল কো-অপারেটিভ ভবন

সমবায় অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক সাফল্য ও অর্জন

ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ-স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে ‘সমবায়’ একটি অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি। সমবায় অধিদপ্তর দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। সরকারের এ লক্ষ্য পূরণে একটি অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে সমবায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ধরন

কৃষিকে কেন্দ্র করে এ উপমহাদেশে সমবায়ের উৎপত্তি হলেও কৃষি ও কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন, পেশাজীবী, আবাসন, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান, পানি ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, পর্যটন প্রভৃতি সেক্টরে সমবায় কার্যক্রমের বিস্তার ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর প্রধানত তিনভাবে কাজ করছে :

ক) সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতির কার্যক্রমের মাধ্যমে;
খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে;
গ) প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে।

সমিতির কার্যক্রম

আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের প্রধান খাতসমূহ :

কৃষি সমবায়

- কৃষকদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি

নৃতাত্ত্বিক সমবায় সমিতির সদস্যরা

ব্যবহার করে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- বর্তমানে কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ৭২ হাজার। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সিআইজি সমিতি প্রায় ২৫ হাজার। কৃষি সমবায়ের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ।

দুগ্ধ সমবায়

- বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' শুরু হয়, যা বর্তমানে 'মিল্কভিটা' নামে পরিচিত।
- বর্তমানে ২,৬৮৩টি প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতিতে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার সদস্য রয়েছে। সমবায় সমিতিগুলো প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৮ লক্ষ ৬০ হাজার লিটার দুগ্ধ উৎপাদন করে।
- গত অর্থ বছরে মিল্কভিটার মাধ্যমে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।
- সমবায় অদিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৮,০০০ উপকারভোগীকে দুগ্ধ উৎপাদনে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মৎস্যজীবী সমবায়

- বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ।

মহিলা সমবায়

- বর্তমানে প্রায় ২৮ হাজার মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ।
- সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে নারীর অংশগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মহিলা সমবায় সহ ও অন্যান্য সমবায়ে নারী সদস্যদের মোট সংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ, যা মোট সদস্যের প্রায় ২৩%।

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সমবায়

- ২০০৮ সালে সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রথম সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ১৩ হাজার সদস্য রয়েছে।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ

- ১৯৪৮ সালে কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রায় ৩৫ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ এবং প্রায় ৫০ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।

আশ্রয়ণ সমবায়

- ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের জন্য বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, ঋণসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত আশ্রয়ণ প্রকল্পে সমবায় সমিতি সংগঠন, ঋণ প্রদান ও আদায় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমবায় অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।
- সারাদেশে প্রায় ১,৫০০টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার জন।

সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়

- বর্তমানে প্রায় ১২ হাজার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি রয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ।

জনবল নিয়োগ

সমবায় অধিদপ্তরের মোট জনবল ৫,০৬৩ জন। এরমধ্যে ১,২০০ এর অধিক পদ শূন্য ইতোমধ্যে ২৫০টি পদের নিয়োগদান সম্পন্ন হয়েছে। ৫১১টি পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

- আধুনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা : সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় একটি বাংলাদেশ

নারীর ক্ষমতায়নে আইজিএ প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা

জাতীয় সমবায় একাডেমি ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সমবায়ীদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমান অর্থবছরে প্রায় ১৮ হাজার সমবায়ীকে সমবায় আইন বিধিসহ বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- সমবায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ আধুনিক ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মান নিশ্চিতকরণ ও প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান অর্জন করে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির জন্য বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কোর্স যেমন—আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্সিং, মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেকট্রিক্যাল প্রভৃতি কোর্সসমূহ ৬০ দিন ব্যাপী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য প্রজেক্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, প্রকিউরমেন্ট, সমবায় অডিটিং, রিসার্স মেথডোলজি প্রভৃতি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- অফলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সের পাশাপাশি অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণা-প্রকাশনা-প্রচারণা

- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। তন্মধ্যে 'বঙ্গবন্ধু ও সমবায় : একটি ঐতিহ্য অনুসন্ধান', 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : প্রয়োগ, অর্জন, প্রাসঙ্গিকতা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বাজার সৃষ্টি : সমবায়ের সম্ভাবনা-প্রেক্ষাপট', 'মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিকে শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ'-শীর্ষক আরও দুটি গবেষণা কার্যক্রম এ বছর সম্পন্ন হবে।
- সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের চিত্রটি সকল শ্রেণির মানুষের নিকট তুলে ধরার জন্য বিগত অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক 'নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার : প্রসঙ্গ সমবায়' শীর্ষক মহিলা সমবায় সমিতির তথ্যভিত্তিক একটি সাফল্য গাথা প্রকাশিত হয়।
- সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। সমবায় নিয়ে এ সকল প্রকাশনা ও কার্যক্রম জনসাধারণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে সমবায় অধিদপ্তর 'অমর একুশে বইমেলা-২০২২'- এ অংশগ্রহণ করেছে। বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের বুকস্টলে নীতিপ্রণেতা, উন্নয়নকর্মী, সমবায়ী, গবেষক, ছাত্র ও আগ্রহীরা সমবায় সম্পর্কে জানার অপরিমেয় সুযোগ পেয়েছে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানসহ সমবায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা, ভিডিও, ডকুমেন্টরি প্রভৃতি সংরক্ষণ ও জনসাধারণের নিকট তুলে ধরার জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ ও লাইব্রেরি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- সমবায় সমিতি আইন যুগোপযোগীকরণ : সমবায় সমিতি আইন অধিকতর সমবায় বান্ধব ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সমবায় সমিতি আইন সংশোধনের একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্প গ্রহণ

বর্তমানে সমবায় সমিতি নিবন্ধন, তদারকি, নিরীক্ষা ও অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ীদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা, বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতাহার, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা—রূপকল্প-২০৪১, এসডিজি-২০৩০ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ডেল্টা প্ল্যান (২১০০) এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে ২০২১-২০২৫ মেয়াদে সমবায় অধিদপ্তরের কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা (Strategic Development Action Plan: 2021-2025) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় অংশীজনদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে সমবায় উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নিম্নোক্ত ৮টি টার্গেট গ্রুপকে বিবেচনা করা হয়েছে—

১) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী
২) নারী
৩) তরুণ উদ্যোক্তা
৪) অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী
৫) কৃষি, মৎস্য, পোল্ট্রি, মাংস ও ডেইরি উৎপাদক
৬) জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী
৭) বিদ্যমান সমবায় সমিতি
৮) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী

প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনায় ৬টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যগুলো হলো :

১) সমবায়ভিত্তিক গ্রামীণ **কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** অর্জন
২) সমবায়ের মাধ্যমে পল্লী জনগণের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক **বিকাশ**
৩) উৎপাদনমুখী সমবায় উদ্যোগে **অর্থায়নের** সুযোগ বৃদ্ধি
৪) সমবায় **প্রশিক্ষণের** আওতা বিস্তৃতকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি
৫) সমবায় অধিদপ্তরের **সক্ষমতা** বৃদ্ধি
৬) নিয়মিতভাবে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের উপযুক্ত **ক্ষেত্রসমূহ** চিহ্নিতকরণ

লক্ষ্যগুলো অর্জনে আগামী ৫ বছরে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে। বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন, প্রস্তাবিত এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ :

চলমান প্রকল্প

১. বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমবায় দর্শন অনুযায়ী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামকে উন্নত ও আধুনিক গ্রামে রূপান্তরের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' পাইলট শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের ৭টি বিভাগের ৯টি জেলার ১০টি গ্রামে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ১০টি গ্রামে ১টি করে মোট ১০টি কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। এছাড়া সুবিধাভোগী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রেডভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে সরকারের ১৭টি দপ্তরের বিভিন্ন সেবা গ্রাম পর্যায়ে প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হবে।

২. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক "দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে যশোর ও মেহেরপুর জেলাধীন ৪টি উপজেলায় ৪২টি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ৪,২০০ জন উদ্যমী কর্মক্ষম নারী ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

১. উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন-২য় পর্যায়

"উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন-২য় পর্যায়" প্রকল্পটি পল্লী অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত নারীর জীবনমান উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এছাড়া দুগ্ধ, দুগ্ধজাত পণ্য ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টির মান উন্নয়ন এবং স্থানীয় ভাবে সম্পদ সৃজন করার লক্ষ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটির সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০,০০০ জন।

২. বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্য পীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি

"বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্য পীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি" প্রকল্পটির সমবায়ের মাধ্যমে উপকারভোগীর পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমবায়ীদের নিজস্ব মূলধন গঠন এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীর টেকসই অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ এছাড়া সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার লিংক স্থাপনে উপজেলাভিত্তিক ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার স্থাপনসহ নারীদের আত্মবিশ্বাসী ও প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩,৬০০ জন সমবায়ী, যার মধ্যে ৫০% নারী।

৩. দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ

"দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ" প্রকল্পটি খুলনা বিভাগের দরিদ্র জনগণের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীর টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদনমুখী খাতে সমবায়ী উদ্যোগ সৃষ্টি করা ও উপকারভোগীদের মাথাপিছু মাসিক আয় বৃদ্ধির সাথে স্থানীয় দরিদ্র্যতা হ্রাস এবং ডিসপ্লে কাম সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার লিংক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪,০০০ জন সমবায়ী যার মধ্যে ৫০% নারী।

৪. সমবায়ের মাধ্যমে সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রকল্প

ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি দলিত সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃজন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় দারিদ্র্য হ্রাস, প্রকল্পভুক্ত সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বাজার লিংক স্থাপন এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ডেইরি ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় পুষ্টির চাহিদা পূরণ সর্বোপরি এই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ, বিকাশ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষভাবে ১৫,০০০ জন যার মধ্যে ৪০% নারী।

৫. বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন

"বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন" প্রকল্পটি কর্মমুখী দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী নারী সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং পল্লী অঞ্চলে সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের আধুনিক পদ্ধতি প্রসারসহ সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার লিংক স্থাপনে, উপজেলাভিত্তিক Cooperative Resources Centre (CRC) স্থাপন। সর্বোপরি এ প্রকল্পটি নারীদের শিক্ষা,

বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম অংশীজন অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

স্বাস্থ্য সেবা এবং সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তাসহ নারী সমবায়ীদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আয়বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০,০০০ জন সমবায়ী যার মধ্যে ৫০% নারী।

৬. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ

"দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্পটি স্থানীয় চাহিদা পূরণে দেশের দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় উন্নত সংকর জাতের গাভি প্রচলনের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ২,০০০ নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং উপকারভোগীদের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫,০০০ জন।

৭. সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

'সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৮. বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কোটবাড়ী কুমিল্লা এর একাডেমিক ভবন ও হোস্টেল ভবন নির্মাণ

৯. জেলা সমবায় কার্যালয় নওগাঁর অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাবলম্বী করার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তিকে পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। সরকারের এ লক্ষ্যপূরণে সমবায়ের মাধ্যমে অবদান রাখার বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও অর্ধশতাব্দীর সমবায় আন্দোলন

ড. জাহাঙ্গীর আলম

বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতার ৫০তম বছর অতিক্রম করেছে। একই সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। এর ফলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী একাকার হয়ে মিশে গেছে। আমাদের জাতির জনক গ্রাম থেকে এসেছেন, গ্রামের কৃষকদের সংস্পর্শে থেকে তাদের উন্নয়নের কথা ভেবেছেন। বলেছেন, 'আমিতো গ্রামেরই ছেলে। গ্রামকে আমি ভালবাসি।' স্বাধীনতার পর ওই গ্রামীণ জীবনের উন্নয়ন এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনি কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য তিনি উদার রাষ্ট্রীয় সহায়তা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন এদেশের কৃষি ও কৃষকের এক মহান প্রাণ-পুরুষ, পরম বন্ধু। দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের কথা ভেবে তিনি ডাক দিয়েছিলেন সমবায় আন্দোলনের। এর মাধ্যমে তিনি কৃষির উৎপাদন বাড়াতে চেয়েছেন। সকল প্রকার শোষণ ও বঞ্চনা থেকে কৃষকদের মুক্ত করতে চেয়েছেন। সমবায়ের মাধ্যমে তিনি আর্থিক সমস্যার সমাধানসহ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চা, সু-আচরণ ও আত্মসহায়তাবোধ নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। ১৯৭২ সালের ৩ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে ভাষণ দানকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের

অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুসম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যম একত্র করতে পারেন, তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতিগোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার।'

বঙ্গবন্ধু আরও বলেছেন, 'আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়-মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে'।

বঙ্গবন্ধু সমবায় আন্দোলনকে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। একে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। এর মাধ্যমেই তিনি সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় সমবায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এবং দেশের জনগণকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি।'

স্বাধীনতার পূর্বে ষাট এর দশকে এদেশে সমবায় আন্দোলন তেমন জোরদার ছিল না। সমিতির সংখ্যা ছিল হাতেগুণা। সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই কম। কুমিল্লাস্থ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সহায়তায় গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ ও কৃষি সমবায় প্রসারিত হচ্ছিল দেশের সীমিত কিছু এলাকায়। পানি সেচ ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের আবাদ উৎসাহিত করা হচ্ছিল বিভিন্ন গ্রামে। সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প। তখন দেশের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে এসবের প্রভাব ছিল খুবই কম। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমবায় আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। ১৯৭২ সালে প্রণীত দেশের সংবিধানে সমবায় মালিকানাকে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালিসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে। (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা'।

বঙ্গবন্ধু দেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে সমবায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এর সদস্য হতো গ্রামের সব মানুষ। তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যৌথ কৃষি খামার। সরকার তাতে ঋণ দেবে, উপকরণ সহায়তা দেবে, সেচের ব্যবস্থা করে দেবে। তাতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে। তার সুফল পাবে জমির মালিক, শ্রম প্রদানকারী ভূমিহীন কৃষক ও সরকার। তবে জমির মালিকানা কৃষকেরই থাকবে। এক্ষেত্রে ভয় না পাওয়ার জন্য কৃষকদের তিনি আশ্বস্ত করেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি ঘোষণা করছি যে পাঁচ বছরের প্ল্যান, প্রত্যেকটি গ্রামে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ হবে। বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেক মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। ...ভুল করবেন না। এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি, তাতে আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব, তা নয়। এ জমি মালিকের থাকবে। আপনার জমির ফসল আপনি পাবেন। কিন্তু ফসলের অংশ সবাই পাবে। ...এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে, আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এজন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে।'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল

'আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়-মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলিকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে'।

দেশদ্রোহী সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায়ের রূপরেখা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। কিন্তু সমবায় আন্দোল থেমে থাকেনি। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেরণায় সমবায় কর্মসূচি পুনরায় গতি লাভ করে। বর্তমানে এদেশে ২৯ প্রকারের সমবায় সমিতি রয়েছে। মোট সমিতির সংখ্যা ১,৯৭,০৬৫টি। তাতে অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা ১,১৭,৪২,৬৭৪ জন। এদের একটি বড় অংশ কৃষি সমবায়ের সঙ্গে জড়িত। তারা কৃষি পণ্যের উৎপাদন করছে, মধ্যস্বত্বভোগীদের নাগপাশ এড়িয়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করছে। সমবায়ের মাধ্যমে তারা উন্নত বীজ, সার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রায়নের ব্যবস্থা করছে। এক্ষেত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই দেশের কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে অধিক উৎপাদন ও লাভজনক বিপণনে উৎসাহিত করেছেন। স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রতি বছর গড়ে ৩.০৯ শতাংশ হারে এবং সদস্য সংখ্যা ২.৮২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানত ও কার্যকরী মূলধনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.৭০ এবং ৯.৭১ শতাংশ (সারণি-১)। বর্তমানে সমবায় খাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে ৯,৬৩,৮৯২ জনের। এক বিশাল কর্মযজ্ঞ সূচিত হয়েছে দেশের সমবায় খাতে।

গত ৫০ বছরে দেশে কৃষির উৎপাদন প্রায় ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে দুধ, ডিম, মাংস ও মাছের উৎপাদন। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রায় খাদ্যে স্বয়ম্ভর। ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রতি হেক্টর ১ টন থেকে ৩ টনে। উচ্চফলনশীল জাত সম্প্রসারিত হয়েছে শতকরা প্রায় ৯০ শতাংশ জমিতে। সেচ এলাকা বিস্তার লাভ করেছে ৭৪ শতাংশ ফসলি এলাকায়। এতে সমবায়ের প্রভাব রয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমাদের কৃষির উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়াতে হবে। বিভিন্ন কৃষি পণ্যের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এর জন্য সমবায় আন্দোলনকে আরো জোরদার করা দরকার।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতি গ্রামে যৌথ কৃষি খামার গড়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। এর বণ্টন ব্যবস্থা হতো তেভাগা পদ্ধতির। ভাগ পাবে জমির মালিক, শ্রমিক ও সমবায়। এ বিষয়ে ৭০ এর দশকের প্রথম দিকে বেশ কিছু মাঠ পর্যায়ের গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ময়মনসিংহের শিমলা, কুমিল্লার বামইল, রাজশাহীর গুরুদাসপুর এবং চট্টগ্রামের রাঙুনিয়া গুমাইবিল প্রকল্প। গবেষণায় দেখা গেছে ফলাফল ইতিবাচক। তাতে উৎপাদন বেড়েছে। শ্রমিক তার মজুরি পেয়েছে বেশি। গ্রামীণ আয়ের বণ্টনে উন্নতি হয়েছে। বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে যৌথ খামার কর্মসূচি আর এগিয়ে যেতে পারেনি। তবে সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ গ্রাম উন্নয়ন তথা কৃষি উন্নয়নের জন্য তা আজও প্রাসঙ্গিক। সম্প্রতি সমবায় বিভাগ প্রণীত বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ প্রকল্প তা মাঠ পর্যায়ে প্রতিপাদন করতে পারে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনপ্রতি আয় ছিল ১০০ মার্কিন ডলারের নিচে। অর্ধশতাব্দী পর এখন তা উন্নীত হয়েছে ২,৫৯১ মার্কিন ডলারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত ১৩ বছর ধরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে গড়ে প্রায় ৭ শতাংশ হারে। ১৯৭২ সালে আমাদের দারিদ্র্যের হার ছিল ৮০ শতাংশ। একটি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে এসে স্থান করে নিয়েছে। তবে আয়বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বরং তার অবনতি ঘটেছে। ২০২০ সালে আয় বণ্টনের গিনি সহগ ছিল শূন্য দশমিক ৪৫, সেটি ২০১৮ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৮। এটা মাঝারি বা পরিমিত পর্যায়ের আয়বৈষম্য হিসেবে বিবেচ্য। গিনি সহগ ০.৫ এর ওপরে গেলে তা হবে উচ্চ আয়বৈষম্যের নির্দেশক। আমরা সেই ক্রান্তিকালে আছি। অতএব এ বৈষম্য কমাতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে আয়বৈষম্য দূর করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নের প্রতি সমবায়কে যত্নবান হতে হবে।

বর্তমানে মানুষে মানুষে বৈষম্য বিরাজমান। বৈষম্য রয়েছে গ্রাম ও শহরের জীবন ধারায়। এগুলো দূর করতে হবে। এর জন্য দরকার গ্রামীণ অর্থনীতিকে বহুমুখী করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি জোরদার করা, পুঁজিগঠন ও আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করা, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা, বাসস্থানের সংস্থান বাড়ানো ইত্যাদি। সমবায়ের মাধ্যমে তা কার্যকরভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। রূপকল্প ২০২১ এর প্রধান লক্ষ্যগুলি ছিল উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য হ্রাস এবং বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ লক্ষ্যগুলো অর্জনে আমরা পুরোপুরি সক্ষম হয়েছি। ভবিষ্যতে রূপকল্প ২০৪১ অনুসারে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ। তখন জনপ্রতি আয় দাঁড়াবে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার। নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য দ্রুত বিলুপ্ত হবে। চরম দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে। দেশের নাগরিকদের কোনো অভাব থাকবে না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে সমবায়। অতএব রূপকল্প ২০৪১ এর বাস্তব রূপায়ণ ও আয়বৈষম্য হ্রাসের জন্য সমবায়কে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

বাংলাদেশের ক্ষেতে-খামারে দ্রুত উৎপাদন বাড়ছে। তাতে সমস্যা বাড়ছে। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। বিপণন প্রক্রিয়ায় লাভবান হচ্ছে এক শ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী ফরিয়া ও ব্যবসায়ী। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের উৎপাদন মৌসুমে ধানের মূল্য থাকে প্রতি মন ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা। পরে তা ১,১০০ থেকে ১,২০০ টাকায় বৃদ্ধি পায়, তখন কৃষকের ঘরে আর বিক্রিযোগ্য ধান থাকে না। এর লাভ পুরোটাই নিয়ে যায় স্থানীয় ব্যবসায়ী, চালের আড়তদার ও চাতালের মালিকরা। তাছাড়া বেগুন উৎপাদন করে শেরপুরের কামারের চরের কৃষকরা প্রতি কেজি বিক্রি করে ৮ থেকে ৯ টাকায়।

সারণি-১ : বাংলাদেশে সমবায় সমিতির পরিসংখ্যান এবং অর্ধশতাব্দীর প্রবৃদ্ধির হার

বিবরণ	১৯৭২ সাল	২০২১ সাল	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার
সমবায় সমিতি সংখ্যা	৪২,০২৫	১,৯৭,০৬৫	৩.০৯
সদস্য সংখ্যা	২৮,৬৫,৫৭৩	১,১৭,৪২,৬৭৪	২.৮২
আমানত (টাকা)	৩৩,০৩,৫১,২৮৭	৯৪,২৬২.৯০ (লক্ষ)	৬.৭০
কার্যকরী মূলধন (টাকা)	১,১৯,০১,৭০,০৫৯	১৫,২৯,৪৮৮.০২ (লক্ষ)	৯.৭১

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে ভাষণ প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকায় তা খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হয় ৫০ টাকায়। দিনাজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতি লিটার দুধ বিক্রি হয় ৪০ টাকায়। ঢাকায় তা কিনতে হয় ৮০ থেকে ৯০ টাকা দরে। সিরাজগঞ্জের বাঘা বাড়িতে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে মিল্কভিটার মাধ্যমে দুগ্ধ বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকার জন্য। সুনামগঞ্জের হাওরে সেই সুবিধা নেই, দুধের উৎপাদনেও তেমন লক্ষণীয় কোনো উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কাজেই দেশের কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য লাভজনক বিপণন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমবায়ের মাধ্যমে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক বিপণনের বহু উদাহরণ আছে। ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়া, ভারত সর্বত্রই সমবায়ভিত্তিক বিপণনের প্রাধান্য রয়েছে। নিউজিল্যান্ড ও ডেনমার্কে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ কৃষিজাত পণ্য সমবায়ের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে বাজারজাত করা হচ্ছে। সে তুলনায় বাংলাদেশে এর অবস্থান দুর্বল। এক্ষেত্রে আর্থিক উন্নয়ন এবং সমবায়ভিত্তিক বিপণন ও উৎপাদনের পর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যমান।

নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটি অগ্রগামী দেশ। বিশ্বের অনেক দেশের কাছেই এক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। শিক্ষা, গবেষণা, রাজনীতি, প্রশাসন, পররাষ্ট্র, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসাসহ সকল ক্ষেত্রেই নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সমবায় সমিতিতে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও কম। বাংলাদেশে মোট সমবায়ীর সংখ্যা ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৩ হাজার। এর মধ্যে ২৩/২৪ শতাংশ নারী। এটা বাড়াতে হবে। দেশের অনেক অনানুষ্ঠানিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হিস্যা ৭০/৮০ শতাংশ। আনুষ্ঠানিক সমবায়ের ক্ষেত্রেও তা অনুসরণযোগ্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন"। সমবায়ের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

চিরায়ত সমবায়ের সবচেয়ে বড় সাফল্য ক্ষুদ্র ঋণ উদ্ভাবন। ব্রিটিশ আমল থেকেই এদেশে চালু রয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ১২,৩৮১। সদস্য সংখ্যা ১৪,৪২,৫১৩ জন। এরা নিজেরা সঞ্চয় করে, ঋণও দেয়। চীনে শতকরা ৮৫ ভাগ কৃষিঋণ সমবায়ভিত্তিক। বাংলাদেশেও এর সম্প্রসারণ ঘটছে। তবে বড় সমস্যা হলো দুর্নীতি। এর প্রতিকারও আছে। গণতন্ত্রায়ন ও স্বচ্ছতা সমবায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে দুর্নীতি থাকবে না।

বর্তমান বিশ্বের মানুষ এক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার অভিযাত্রী। এখানে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রধান অবলম্বন সমবায়। আমাদের দেশের সমবায় চিন্তকদের অবশ্যই ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের স্বার্থে কাজ করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন নিশ্চিত করার একটি কৌশল হচ্ছে সমবায়। এটি শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়। মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নির্ভরযোগ্য একটি অবলম্বন সমবায়। এটি শততা প্রতিষ্ঠা এবং মনন ও মানসিকতা পরিবর্তনের উত্তম পন্থা। সমবায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রান্তিক জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাবে। এর জন্য দেশে সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় 'দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল'।

ড. জাহাঙ্গীর আলম : কৃষি অর্থনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা। সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ। প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট। গবেষণা ক্ষেত্রে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদকপ্রাপ্ত।

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন

ড. মিল্টন বিশ্বাস

২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ শুরু হওয়া 'মুজিববর্ষ' করোনা মহামারির কারণে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। চলতি মুজিববর্ষে জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং একইদিন জাতীয় শিশু দিবস। জাতিরপিতার জন্মদিনে জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এরকম দিন এখনকার প্রজন্মের জীবনে আর আসবে না। তাছাড়া ১৯৯৭ সাল থেকে জাতীয় শিশু দিবস পালন করা শুরু হলেও বঙ্গবন্ধুকে নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ এ প্রজন্মের হয়েছে গত ১৩ বছরে। তারা জেনেছে, স্বাধীনতার আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু শিশুদের ভালোবাসতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতে দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিতে হবে আজকের শিশুদেরই। তাই শিশুরা যেন সৃজনশীল মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে তিনি সব সময়ই তা প্রত্যাশা করতেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন মাটির মানুষ ও সাধারণ মানুষের নেতা। এজন্য তাঁর সহজসরল আচরণ শত্রু-মিত্র সকলকে আকৃষ্ট করতো। মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত ছিলেন তিনি আজীবন। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়। কারণ তিনিও শিশুদের ভালোবাসতেন। বিশ্বের সকল মহামানব শিশুবান্ধব ছিলেন,

শিশুদের প্রিয় ছিলেন। মহান নেতা হয়েও, রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ততা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু কখনো তাঁর শিশুপুত্র রাসেলকে আদর করতে ভোলেননি। কোথাও যেতে তিনি রাসেলকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। শিশু রাসেলও তাঁকে খুব ভালোবাসতো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর 'আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা' গ্রন্থে লিখেছেন, রাসেল আব্বাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতো। আব্বাকে মোটেই ছাড়তে চাইতো না। তিনি আরো লিখেছেন, 'রাসেলের সব থেকে আনন্দের দিন এলো যেদিন আব্বা ফিরে এলেন। এক মুহূর্ত যেন আব্বাকে কাছ ছাড়া করতে চাইতো না। সব সময় আব্বার পাশে ঘুরে বেড়াতো।' শিশুরা সুন্দর স্বপ্ন দিয়ে তাদের নিজস্ব জগৎ নির্মাণ করে। বঙ্গবন্ধুও তাঁর রাজনৈতিক জীবন স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করেছিলেন। শিশুদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে তারই আলোকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, শিশু হাসপাতাল ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। এছাড়া শিশুদের জন্য আরো নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন শিশুদের প্রিয়জন। শিশু-কিশোরদের কাছেও তিনি ছিলেন 'মুজিব ভাই'। ১৯৬৩ সালে ঢাকা প্রেস ক্লাবে আয়োজন করা হয় দশ দিনব্যাপী শিশুমেলা। ওই শিশুমেলায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এই পবিত্র শিশুদের সঙ্গে মিশি মনটাকে একটু হালকা করার জন্য।' শামসুজ্জামান খান স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে- '১৯৬৩ সালে শেখ সাহেবকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ও কাছে পাওয়ার সুযোগ ঘটে। আমরা ওই বছরে কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার উদ্যোগে ঢাকাস্থ প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে এক শিশু-কিশোর আনন্দমেলার আয়োজন করি। সেই মেলায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি আগ্রহসহকারে আসেন এবং মেলার প্রদর্শনী ও স্টল পরিদর্শন করেন। আনন্দমেলার নিরাপত্তাসহ অন্যান্য বিষয় দেখাশোনার জন্য কচি-কাঁচার মেলার সদস্যদের নিয়োগ করা হয়। পুলিশ বা শান্তিবাহিনী, গোয়েন্দা- সবই ছিল কচি-কাঁচার মেলার সদস্য। শেখ সাহেব যখন প্রদর্শনী দেখছিলেন তখন তাঁর কাছ থেকে মেলার গোয়েন্দা বাহিনী একটি লোককে আটক করে। তার চেহারা উসকো-খুশকো, গায়ে একটি কাঁথা জড়ানো। ক্ষুদে গোয়েন্দারা তার দেহ তল্লাশি করে তার কাছে মেলার একটি ম্যাপ ও কিছু কাগজপত্র পায় এবং পরে দেখা যায় ক্ষুদে গোয়েন্দারা যাকে পাকড়াও করেছে সে সরকারের আসল গোয়েন্দা। শেখ সাহেবের পিছু নিয়ে আনন্দমেলায় ঢুকেছে। শেখ সাহেব সরকারি গোয়েন্দাকে কাছে ডেকে বললেন, 'চান্দু, এখানেও আমার পিছু নিয়েছ- শিশুদের সঙ্গে একটু আনন্দ করবো তাতেও ফেউ লাগিয়ে রেখেছে সরকার। যা মাফ করে দিলাম।' পরে দাদাভাইয়ের দিকে ঘুরে বললেন, দাদাভাই, আপনার গোয়েন্দারা সরকারি গোয়েন্দাদের ওপর টেক্কা দিয়েছে, সাবাস!'

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-এর মার্চ মাসে রাষ্ট্রীয় সফরে সোভিয়েত ইউনিয়ন গিয়েছিলেন। সে সময় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পরামর্শে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারের অত্যাচারের দৃশ্য নিয়ে ৫ থেকে ১২ বছরের ১৫-১৬ জন শিশুর আঁকা ছবি সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভকে উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য গণভবন 'সুগন্ধা'য় উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন ড. আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন ও লুৎফুল হায়দার চৌধুরী। শিশুদের আঁকা ছবিগুলো বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন, 'আমার দেশের শিশুরা এমন নিখুঁত ছবি আঁকতে পারে, এসব না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি আরো বলেছিলেন, 'আজকের কর্মব্যস্ত সারাটা দিনের মধ্যে এই একটু খানি সময়ের জন্য আমি শান্তি পেলাম। শিশুদের সান্নিধ্য আমাকে সব অবসাদ থেকে মুক্তি দিয়েছে।' বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'শিশু হও, শিশুর মতো হও। শিশুর মতো হাসতে শেখো। দুনিয়ার ভালোবাসা পাবে।'

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন করেন। সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে শিশুদের অগ্রগতির বিশেষ বিধান প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য এবং জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শিশু উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে করেন বাধ্যতামূলক। ১৯৭৩ সালে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে করা হয় জাতীয়করণ। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৪-এর ২২ জুন শিশু আইন প্রণয়ন করেন। এর ১৫ বছর পর জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ তৈরি করে। বাংলাদেশ ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। গ্রহণ করা হয়েছে জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০10। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত শিশু নীতিকে আরো যুগোপযোগী করতে ঘোষিত হয় শিশু আইন ২০১৩। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পরিত্যক্ত শিশুদের সেবা ও ভাতা প্রদান, পথশিশুদের পুনর্বাসনসহ তাদের জীবনমান উন্নত করতে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিশু শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে স্কুল টিফিন, শিশুর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন কার্যক্রম। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই বিতরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে করা হয়েছে জনকল্যাণমুখী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা নামক মহাকাব্যের 'মহাকবি', তিনি বিশ্ব মিডিয়ার দৃষ্টিতে 'পোয়েট অব পলিটিক্স'। তাঁর ছিল দুর্নিবার গ্রন্থপ্রীতি। তিনি ছিলেন সচেতন পাঠক। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, উইনস্টন চার্চিল, আব্রাহাম লিংকন, নেলসন ম্যান্ডেলা, জন এফ কেনেডি, ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রমুখ রাজনৈতিক নেতার মতো যখনই অবসর পেতেন তখনই তিনি বইয়ের বিচিত্র জগতে হারিয়ে যেতেন। বঙ্গবন্ধু যে প্রচুর শিল্প-সাহিত্যের বই পড়তেন তা তাঁর ভাষণ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র আর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' এবং 'আমার দেখা নয়াচীন' থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে রবার্ট পেইন দেখেছেন, জর্জ বার্নার্ডশ, বার্ট্রান্ড রাসেলের রচনাবলি, মাও সেতুং স্বাক্ষরিত গ্রন্থ। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী ছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণকালে একই গাড়িতে করাচি আসার পথে উর্দুভাষী

বঙ্গবন্ধু ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন, 'আমার দেশের শিশুরা এমন নিখুঁত ছবি আঁকতে পারে, এসব না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি আরো বলেছিলেন, 'আজকের কর্মব্যস্ত সারাটা দিনের মধ্যে এই একটু খানি সময়ের জন্য আমি শান্তি পেলাম। শিশুদের সান্নিধ্য আমাকে সব অবসাদ থেকে মুক্তি দিয়েছে।' বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'শিশু হও, শিশুর মতো হও। শিশুর মতো হাসতে শেখো। দুনিয়ার ভালোবাসা পাবে।'

কয়েকজন পাকিস্তানিকে তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। ('অসমাপ্ত আত্মজীবনী', পৃ. ২১৭) ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের শান্তি সম্মেলনে যোগদান করে তিনি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। ('অসমাপ্ত আত্মজীবনী', পৃ ২২৮)

১৯৪৮ থেকে ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকদের রুদ্র রোষে ২৪টি মামলায় ১৮ বার জেলে নিক্ষিপ্ত হন শেখ মুজিব। তিনি সর্বমোট ১২ বছর জেল খেটেছেন। আর দশ বছর কড়া নজরদারিতে ছিলেন। জেলবন্দি নিঃসঙ্গ জীবনেও বই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। ২১ ডিসেম্বর, ১৯৫০ সালে ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট জেল থেকে বঙ্গবন্ধু একটি চিঠি লিখেছিলেন গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। সেই চিঠিটি তৎকালীন সরকার বাজেয়াপ্ত করলেও গবেষকরা পরবর্তী সময় উদ্ধার করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, '১৯৪৯ থেকে আব্বা যতবার জেলে গেছেন কয়েকখানা নির্দিষ্ট বই ছিল যা সব সময় আব্বার সঙ্গে থাকত। জেলখানার বই বেশিরভাগই জেল লাইব্রেরিতে দান করে দিতেন, কিন্তু আমার মা'র অনুরোধে এই বই কয়টা আব্বা কখনো দিতেন না, সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তার মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী, শরৎচন্দ্র, নজরুলের রচনা, বার্নার্ড শ'র কয়েকটা বইতে সেন্সর করার সিল দেয়া ছিল। জেলে কিছু পাঠালে সেন্সর করা হয়, অনুসন্ধান করা হয়, তারপর পাস হয়ে গেলে সিল মারা হয়। পরপর আব্বা কতবার জেলে গেলেন তার সিল এই বইগুলোতে ছিল। মা এই কয়টা বই খুব যত্ন করে রাখতেন। আব্বা জেল থেকে ছাড়া পেলেই খোঁজ নিতেন বইগুলো এনেছেন কি না। যদিও অনেক বই জেলে পাঠানো হতো। মা প্রচুর বই কিনতেন আর জেলে পাঠাতেন। নিউ মার্কেটে মা'র সঙ্গে আমরাও যেতাম। বই পছন্দ করতাম, নিজেরাও কিনতাম। সব সময়ই বই কেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিল। প্রচুর বই ছিল। সেই বইগুলো ওরা (পাকিস্তানিরা) নষ্ট করে। বইয়ের প্রতি ওদের আক্রোশও কম না। আমার খুবই কষ্ট হয় ঐ বইগুলোর জন্য যা ঐতিহাসিক দলিল হয়ে ছিল, কিন্তু ১৯৭১ সালে সবই হারালাম।' (শেখ হাসিনা : শেখ মুজিব আমার পিতা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ৭০-৭১)

বঙ্গবন্ধু একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কেবল সাধারণ মানুষ কিংবা কৃষক-শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিলেন না তিনি ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। স্বাভাবিকভাবে স্বীয় শ্রেণির শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। তাছাড়া পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন- 'শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দের সৃষ্টিশীল বিকাশের যে-কোনো অন্তরায় আমি এবং আমার দল প্রতিহত করবে।' (আতিউর রহমান, 'বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বঙ্গবন্ধু') ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের পরপরই বঙ্গবন্ধু কাজী নজরুল ইসলামকে অনুরোধ করে ঢাকায় নেন। ১৯৭২ সালের ২৫ মে ঢাকায় কবির বাসায় যাবার সময় ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর থেকে বের হয়ে 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করতে করতে পথ হেঁটেছেন বঙ্গবন্ধু। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র সূত্র অনুযায়ী আব্বাসউদ্দিনের ভাটিয়ালি গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। এই কণ্ঠশিল্পীর বাংলা ভাষা রক্ষার আকুতিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সংগ্রামে অবদান রাখেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী হয়েও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে 'স্যার' সম্বোধন করতেন। প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেছিলেন- 'এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনির মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।' (দৈনিক ইত্তেফাক ১৬/২/১৯৭১) তার আগে ৯ জুন ১৯৬৯ সালে বাংলার সবচাইতে জনপ্রিয় সাংবাদিক 'মানিক ভাই' প্রবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমান লেখেন 'তিনি ছিলেন এক সার্বক্ষণিক প্রেরণা। অতি বড় দুর্দিনেও তাঁর ওপর আমরা ভরসা রাখতে পেরেছি। কাছে গিয়ে সাহস ফিরে পেয়েছি। তিনি নিষ্ঠাবান সংগ্রামী ছিলেন। সংগ্রামীদেরকে তিনি ভালোবাসতেন।' (বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম) বেবি মওদুদ লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধকালে ক্ষতিগ্রস্ত দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকা দুটিকে বিজয় লাভের পর পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড় করাতে সবরকম সহযোগিতা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।' (সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও শেখ মুজিব, ২০১৩) বঙ্গবন্ধুর শতাব্দীতে কয়েকটি দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদও ছিলেন কোনো না কোনো পত্রিকা বা রাজনৈতিক সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। মহাত্মা গান্ধী নিউ ইন্ডিয়া, মতিলাল নেহরু ইন্ডিপেনডেন্ট, মাওলানা মোহাম্মদ আলী কমরেড, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বেঙ্গলি, জওয়াহেরলাল নেহরু ন্যাশনাল হেরাল্ড, অরবিন্দ ঘোষ বন্দেমাতরম, সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড, বিপিন চন্দ্র পাল ইয়ং ইন্ডিয়া, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নারায়ণ, ফজলুল হক কৃষক ও নবশক্তি পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন নতুন দিন, ইত্তেহাদ, ইত্তেফাক, মিল্লাতসহ কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে।

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি সবসময়ই কাছে পেয়েছেন শিল্পী-সাহিত্যিকদের। জসীমউদদীন, সুফিয়া কামাল, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, হাশেম খান, সমরজিত রায় চৌধুরী প্রমুখ কবি ও চিত্রশিল্পী এবং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক ছবি রয়েছে। ১৯৭৩ সালে ফরাসি লেখক আঁদ্রে মালরোর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের মাঝেও তাঁকে দেখা গেছে। ১৯৭৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠানে তিনি বলেন- 'মানবাত্মার সুদক্ষ প্রকৌশলী হচ্ছেন দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী।' এজন্য তাঁদের প্রতি তাঁর প্রাণের টান এত। অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্মৃতিচারণ'-এ আছে, ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মন্মথ রায়কে বাম পার্শ্বে ও তাঁকে দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়ে সেদিন নানা অন্তরঙ্গ কথা বলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি অসুস্থ কবি হুমায়ূন কাদির, আবুল হাসান ও মহাদেব সাহাকে সুচিকিৎসার জন্য বার্লিন, মস্কো, লন্ডন প্রেরণ করেন এবং একটি কবিতা লেখার জন্য দাউদ হায়দারকে ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাত থেকে রক্ষা এবং নিরাপত্তা দিয়ে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কবি আল মাহমুদকে জেল থেকে মুক্ত করে শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি ছিলেন নাটকের একজন সুহৃদ। টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটকের ওপর থেকে প্রমোদকর ও সেন্সর প্রথা সহজতর করেছিলেন নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। চলচ্চিত্রের উন্নয়নে তাঁর অবদান ছিল। প্রাদেশিক পরিষদে এফডিসি'র বিল উত্থাপন করেন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল। তখন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল চলচ্চিত্র বিষয়ক দপ্তর। ১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয় বাংলাদেশের ১৮ এবং ভারতের ৪ জন বিশিষ্ট শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী ও বেতারকর্মীকে। অর্থাৎ কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে তিনি যুক্ত করেছিলেন শিক্ষক-প্রকৌশলী ও পেশাজীবীদের, শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রশাসনের সঙ্গে রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্থ ছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্গমাতা' কবিতার পঙক্তি- 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,/রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি' এবং ১৯৭২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায়

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাষণ দেবার সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছেন। 'নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি' এবং 'নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস' তাঁর কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল বেশি। তাঁর অন্তর দখল করে রেখেছিলেন বিশ্বকবি। রাজনৈতিক জীবনে দুঃখ-দৈন্য-সংকটে আবৃত্তি করতেন- 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা' কিংবা 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে...' বহুল পরিচিত চরণসমূহ। জেলে যাবার সময় 'সঞ্চয়িতা' হাতে তুলে নিতেন। বোঝা যায় একমাত্র সঙ্গী বা অনুপ্রেরণা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা একাডেমি আয়োজিত ১৯৭২ সালের ৮ মে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীতে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ ও অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে। কিন্তু সত্য, শ্রেয়, ন্যায় ও স্বাজাত্যের যে চেতনা বাঙালি কবিগুরুর কাছ থেকে লাভ করেছেন, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে তারও অবদান অনেকখানি। বাঙালির সংগ্রাম আজ সার্থক হয়েছে। বাঙালির রবীন্দ্র-সম্মাননার চেয়ে বড় কোনো দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।'

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে শুনতে সকালের নাস্তা সারতেন। এক স্মৃতিচারণে মাহবুব তালুকদার টুঙ্গিপাড়ার সফরসঙ্গী হিসেবে সকালে ঘুম থেকে উঠে বঙ্গবন্ধুকে নৌযানে বসে নদীর দুপাড়ের গ্রাম-বাংলার দৃশ্য দেখে আবৃত্তি করতে শুনেছিলেন—'নম নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি/ গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি' রবীন্দ্র পঙক্তিমালা। জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি ১৯৫৬ সাল থেকেই তাঁর প্ররোচণায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে ঠিক করে ফেলেন সোনার বাংলা গড়ার। গানটি সর্বত্র প্রচারে শেখ মুজিবের সক্রিয় ভূমিকার কথা জানিয়েছেন প্রফেসর ড. সনজীদা খাতুন। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ মে ২০০৫)

অর্থাৎ শিল্প-সংস্কৃতির একজন রসবোদ্ধা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেশ-বিদেশের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের গভীর সম্পর্ক ছিল। এজন্য ১৫ আগস্টের (১৯৭৫) হত্যাকাণ্ড রাজনীতিবিদদের সাথে সাথে অভিঘাত রাখে শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবিদের চেতনায়। পরবর্তীতে তাঁরা তাঁদের লেখনিতে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। মূলত জাতিকে এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে প্রেরণা জুগিয়েছেন শিল্প-সাহিত্য সমাজের ব্যক্তিবর্গ।

বঙ্গবন্ধুর শিল্প সংস্কৃতি ভাবনায় শিশু এবং দুঃখী মানুষের কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। লোকজ সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বিস্তর। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সোনারগাঁ-এ 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায়। ১৯৭২ সালের ১-৫ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে সেখানকার নেতৃবৃন্দের জন্য উপহার হিসেবে তিনি নিয়ে যান কচি-কাঁচার মেলার শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম। রাজনীতি করে যেমন গরিব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন তেমনি শিল্প-সংস্কৃতির চেতনাসম্পন্ন উপযুক্ত জাতি গঠনে নিবেদিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর শিল্প সংস্কৃতি ভাবনায় শিশু এবং দুঃখী মানুষের কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। লোকজ সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বিস্তর। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সোনারগাঁ-এ 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায়। ১৯৭২ সালের ১-৫ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে সেখানকার নেতৃবৃন্দের জন্য উপহার হিসেবে তিনি নিয়ে যান কচি-কাঁচার মেলার শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম। রাজনীতি করে যেমন গরিব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন তেমনি শিল্প-সংস্কৃতির চেতনাসম্পন্ন উপযুক্ত জাতি গঠনে নিবেদিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

রাজনীতির অমর কবি বঙ্গবন্ধুর মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার অঙ্গীকার পরবর্তীকালে দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা ভুলতে পারেননি। দেশ পরিচালনায় খুব কম সময় পেলেও তাঁর আত্মবলিদান প্রেরণার শতধারায় উৎসারিত এখনও। তাঁকে আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী করে তুলেছেন শিল্পী-সাহিত্যিকরা সৃষ্টি হয়েছে কবিতা, গল্প, নাটক, উপণ্যাস, চিত্রকলা। আদর্শের মৃত্যু নেই যেমন কবি পাবলো নেরুদা লিখেছেন—'কোনো কোনো রক্তের দাগ কিছুতেই শুকোবার নয়।' বঙ্গবন্ধুর রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। প্রেরণার উৎসে মহীরুহ তিনি। এজন্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের জাগরণ হলো। বিনা দ্বিধায় আমরাও বলে উঠলাম, ওই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যতদিন লড়াই চলবে, ততদিন আমরাও সঙ্গে আছি। বাঙালি হিসেবে আমরাও সহযোদ্ধা।' (আমরা কি বাঙালি) ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেওয়া মন্মথ রায় লেখেন (আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন স্মরণিকা) 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে অবলম্বনে লিখিত আমার দুইটি নাটক এক. স্বাধীনতার ইতিহাস, দুই. আমি মুজিব নই- গ্রন্থ দুইটি তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে ধন্য হতে পেরেছিলাম।'

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধির ১০ ধারায় মৃতব্যক্তির মাহাত্ম্য প্রচার নিষিদ্ধ করে খুনি সরকারের তরফ থেকে এক ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে ২১ বছর 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৯৬ থেকে পুনরায় ব্যবহৃত হতে থাকে শব্দটি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিরপিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার যুগ শুরু হয়। একইসঙ্গে জাতীয় শিশু দিবসের প্রচলন সেই আমল থেকেই।

ড. মিল্টন বিশ্বাস: বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, email-drmiltonbiswas1971@gmail.com

কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সমবায়

ড. কিউ আর ইসলাম

গ্রামে ও শহরে জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার অগ্রগতির ফলে সমবায় উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সমবায় সমিতি (সংশোধন আইন), ২০১৩ গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সমবায় সংগঠনগুলোকে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎসাহিত করছে। চিরাচরিত বিপণন বা বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি থেকে রেহাই পেয়ে কৃষকদের শ্রম বিনিয়োগে উৎপাদিত পণ্য যথার্থ মূল্যে বিক্রয়ে সমবায়ভিত্তিক বাজারজাতকরণ বা কোঅপারেটিভ মার্কেটিং এর সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে। সমবায় সদস্যদের পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রসারসহ শর্তাবলি নির্ধারণ ও দরাদরি করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। সমিতি গঠন করে সদস্যরা নিজেরাই বাজারজাত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। কৃষিপণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে নিজস্ব ব্র্যান্ডে বাজারজাতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকেরা সংগঠিত হয়ে বাজারজাতকরণ সমিতি গঠন করে সরাসরি এবং ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে বিক্রয় করে অধিকতর লাভবান হবে। বাজার চাহিদা নিরূপণ করে ফসল উৎপাদন, আবাদ সময়, পরিমাণ ও কর্তন ও সংগ্রহ কাল নির্ধারণে সহায়ক হবে। সদস্যরা নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলে পণ্য পরিবহনে স্বাবলম্বী হতে পারবে। ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ প্রসারিত করেছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমবায়ভিত্তিক বাজারজাতকরণ সদস্যদের সুবিধা প্রদানে সহায়ক হচ্ছে। দেশের উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষক খাদ্য উৎপাদন করে। কৃষি কর্মসংস্থানের অন্যতম খাত। সমবায়ভিত্তিক বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার

উন্নয়ন খাদ্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি, অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং লাভজনক কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাজারের সাথে কৃষকের সম্পর্ক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকের সমস্যা শুধুমাত্র ফসল উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাত এবং যথাযথ বিনিময় মূল্য পেয়ে আয়-উপার্জনেও কৃষকেরা সমস্যার সম্মুখীন হয়। সরাসরি ভোক্তার পরিবর্তে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে চলে যায়। মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষিপণ্য কৃষকদের থেকে নিয়ে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। বাজার থেকে ভোক্তাদের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের মূল্য অনেকটা নির্ভর করে মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর। এই ক্রয় মূল্য এবং কৃষকদের বিক্রয় মূল্যের মধ্যে বেশ ব্যবধান থাকে। ভোক্তারা পণ্য ক্রয়ে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন তার একটা বড় অংশ মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে থেকে যায়। পণ্য বিক্রি করে কৃষকদের পক্ষে উৎপাদন খরচ ওঠানো দুরূহ হলেও বাজারজাত করে মধ্যস্বত্বভোগীরা ঠিকই লাভবান হয়। কৃষি উৎপাদনে কৃষকেরা তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন সুবিধা পেলেও পণ্য বিক্রয় করে যথাযথ মূল্য প্রাপ্তিতে বর্তমান বাজার ব্যবস্থা ততটা সহায়ক নয়। ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সাথে স্বতন্ত্রভাবে লেনদেনের ক্ষেত্রে পণ্যের যথাযথ মূল্য পাওয়া সচরাচর সম্ভব হয় না। পণ্য বিক্রয়ে ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত মূল্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। সমবায়ভিত্তিক বাজারজাত করে কৃষকদের সমষ্টিগত সংগঠন এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্ত হতে ভূমিকা রাখতে পারে। মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে বের হয়ে এসে উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মূল্য পেয়ে কৃষকেরা লাভবান হতে পারে। উৎপাদনকারীদের সাথে ভোক্তাদের সরাসরি সংযোগ বা যোগাযোগ হওয়ার সুযোগ থাকে। চাহিদা ও পছন্দমতো পণ্য পেয়ে ভোক্তারা খুশি হয়।

বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতি সদস্যদের সহজ শর্তে ও সাশ্রয় মূল্যে কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করে সদস্যদের সরবরাহ করতে পারে। এতে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমে আসে। সমবায় উদ্যোগে বাজারজাত করে দুইভাবে কৃষকেরা ফসল উৎপাদন অধিকতর লাভজনক করে তুলতে পারে। প্রথমত সাশ্রয় মূল্যে কৃষি উপকরণ ক্রয়ে উৎপাদন খরচ কমিয়ে। দ্বিতীয়ত যথাযথ মূল্যে বিক্রয় করে কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ লাভজনক করে। বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সমবায় উদ্যোগ সহায়ক হয়। রাস্তাঘাট এবং পরিবহন ও সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে সুবিধা পাওয়া সহজ হয়। প্রক্রিয়াজাত প্রযুক্তি ও উপকরণ সংগ্রহ সহজতর হয়। পরিবহন ব্যয় কমে আসে। পণ্য ক্রয়ে ব্যবসায়ীরা আকৃষ্ট হয়। প্রত্যন্ত এলাকায়, দূরবর্তী স্থানে উপযুক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রয় সম্ভব হয়।

এক সময়ে কৃষকেরা বিপণনে খুব বেশি একটা গুরুত্ব দিত না। পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ ছিল কৃষি উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য। ফলন ভালো হলে ঘরবাড়ি মেরামত এবং বিয়েশাদির আয়োজন করা হতো। কাপড়চোপড় কেনা হতো। কৃষি উৎপাদনে মূল সমস্যা ছিল অনাবৃষ্টি, খরা ও বন্যা। বর্তমানে কৃষি উৎপাদন থেকে খাদ্য চাহিদা পূরণের সাথে বিভিন্ন রকম পারিবারিক খরচ বাবদ অর্থের জন্য ফসল বিক্রি করতে হয়। খাদ্য চাহিদা ও খরচ মেটাতে ফলন বৃদ্ধির জন্য কৃষি উৎপাদনে ব্যয় বেড়েছে। উৎপাদনে ব্যয় কমিয়ে আয় বৃদ্ধি কৃষকদের বিশেষ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

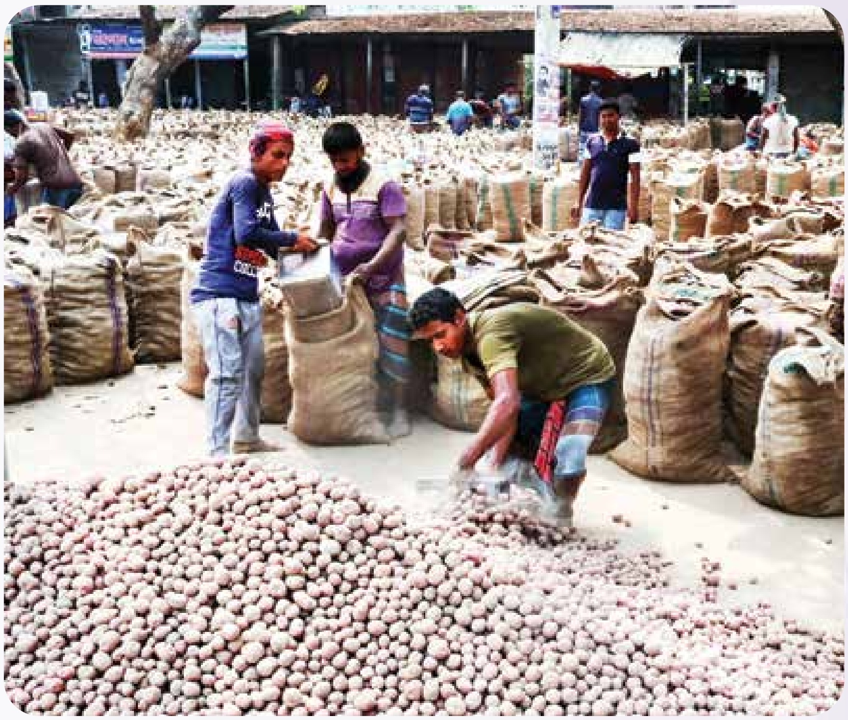

এই উপমহাদেশে সমবায়ভিত্তিক বিপণনের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। ওই সময় কোঅপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি অ্যাক্ট পাশ করা হয়। সমষ্টিগত উদ্যোগে তুলা বিপণনে উৎসাহিত করতে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার স্বতন্ত্রভাবে বিপণনের পরিবর্তে দলীয়গত বিপণনে উৎসাহিত করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটি সংগঠিত বিপণনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেয়। সংগঠিত হয়ে কৃষকদের অধিকতর লাভজনক মূল্যে তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজারজাতে সহযোগিতার জন্য সমিতি গঠনে জোর দেয়া হতে থাকে। বাংলাদেশে কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জেলায় সমবায়ভিত্তিক বিপণন শুরু হয়। বিশেষ করে দুগ্ধ ও সবজি বিপণনে। এই সমস্ত সমবায় উদ্যোগসহ শত বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে সমবায়ভিত্তিক বাজারজাতকরণ অধিকতর উপযোগী করে গড়ে তোলা যেতে পারে। সেই সাথে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, বাজার পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ সমবায়ভিত্তিক বাজারজাতকরণ সফল করে তুলতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতি কার্যক্রম অধিকতর সফল করে তুলবে। এ ব্যাপারে সমবায় অধিদপ্তরের বিশেষ প্রয়োগিক কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

ড. কিউ আর ইসলাম : কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি), ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ)/খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)/বিশ্বব্যাংক, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত একাধিক পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে কনস্যালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন। অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়নে গঠিত আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স এর সদস্য ছিলেন। বর্তমানে জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়ধীন একটি প্রকল্পে কর্মরত।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন
কৌশল ও আমাদের দায়

মোঃ আহসান কবীর

প্রারম্ভিকা

পরিকল্পনাহীন ব্যক্তিজীবনও ভাবা যায় না। প্রতিটি ব্যক্তি নিজের অজান্তেই একটা পরিকল্পনা অনুসরণ করে চলে। কর্মক্ষেত্রও এর বিকল্প নয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূলত একটি পরিকল্পনা (এপিএ) এর নাম। সরকারি দপ্তরসমূহে এপিএ অনুসরণ করে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৫-'১৬ অর্থবছর থেকে। একটি সরকারি দপ্তরের জন্য এপিএ মূলত একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা যার মেয়াদ এক বছর। প্রতিবছর এ পরিকল্পনা নতুনভাবে প্রণয়ন করতে হয়। সেই সাথে আগের বছরের এপিএ মূল্যায়ন করতে হয়। অর্থাৎ এপিএ তে নির্ধারিত কর্মকাণ্ড যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কি না, তা একটি Monitoring and Evaluation Tool এর ভিতর দিয়ে যায়। এর আউটপুট কি হচ্ছে, তা মূলত পরিকল্পনা প্রণয়ন, টার্গেট নির্ধারণ ও ইনপুটের ওপর নির্ভর করে। এখন প্রায় শতভাগ সরকারি দপ্তর এক বছর মেয়াদি এ পরিকল্পনা অনুযায়ী দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করছে। প্রশ্ন থেকে যায়, ২০১৫-'১৬ এর পূর্বে কি সরকারি দপ্তরের জন্য কোনো রূপরেখা ছিল না! তা থাকলেও আমি মনে করি সার্বজনীন কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সেদিক বিবেচনায় সরকারি দপ্তরের কার্যক্রম জনমুখী ও টাইম-বাউন্ড করতে এপিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সম্প্রতি আমি এপিএ বিষয়ক একটি কর্মশালায় অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করি। সেখানে সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব এপিএ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তার নিজস্ব পদ্ধতি সাবলীলভাবে আমাদেরকে জানান। অবাক হয়েছি এই ভেবে যে, সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিজ অফিসে এপিএ বাস্তবায়ন নিয়ে যেভাবে ভাবেন, বাস্তবায়নের নিরলস চেষ্টা করেন, সেখানে মাঠ পর্যায়ের কোনো দপ্তর এপিএ বাস্তবায়ন নিয়ে কমজোর চেষ্টা করা একটি আত্মাহুতির মতোই মনে হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অদূর ভবিষ্যতে এপিএ মূল্যায়নে প্রাপ্ত মান দ্বারা এপিএ বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বার্ষিক কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন করা হবে। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এ বিষয়ে কাজ চলছে এবং নিঃসন্দেহে বিষয়টি সরকারের সকল পর্যায়ে দ্রুত ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

এপিএ কেন/এপিএ এর গুরুত্ব

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং কর্মকৃতি বা Performance মূল্যায়ন করাই মূলত এপিএ এর প্রধান লক্ষ্য। সরকারি দপ্তরের রুটিনধর্মী ও প্রসেসধর্মী কাজ যথাসম্ভব পরিহার করে পারফরমেন্সধর্মী কাজ বাড়ানো এপিএ এর অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা জানি বর্তমান সময় উন্নয়ন প্রশাসনের সময়। জনগণের প্রতি সরকারের জবাবদিহিতা অনেকগুণে বেড়ে গেছে। এটি জনগণকে ক্ষমতায়ন করারই একটি যথাযথ প্রয়াস। তৃণমূল পর্যায়ের সেবাগ্রহীতাও যেন সরকারের কোনো সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, তার প্রতিফলন এপিএ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। কীভাবে? আমরা জানি এপিএ তে প্রতিবছর একটি সরকারি দপ্তর টার্গেট নির্ধারণ করে তার কার্যক্রম তালিকা ও কর্মসূচক প্রকাশ করে। বছর শেষে পারফরমেন্স ডিক্লেয়ার করে। ফলে মাঠ পর্যায়ে জনগণকে সেবা দেওয়া ছাড়া অলস/কর্মবিমুখ হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। এপিএ এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এখানে কর্মতালিকা/কর্মসূচক ও টার্গেট নির্ধারণসহ এপিএ প্রণয়নের সামগ্রিক কাজটি Bottom up Approach অনুসরণ করে। ফলে কোনো দপ্তরের এই বলে পার পাওয়ার সুযোগ নেই যে, সে জনগণকে এপিএ তে উল্লিখিত কোনো সেবা প্রদান করতে অপারগ। ফলে এপিএ প্রণয়নের মাধ্যমে যেমন সরকারি দপ্তর গতিশীল হয়ে উঠেছে, তেমনি সরকারি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসাথে সেবাগ্রহীতা জনগণ ক্ষমতায়িত হয়েছে।

এপিএ কাঠামো

এপিএ কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি কর্মক্ষেত্র, কার্যাবলি, কর্মসম্পাদন সূচক এর বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা, প্রকৃত অর্জন ও প্রক্ষেপণের একটি ম্যাট্রিক্স। Business of Allocation অনুযায়ী একটি সরকারি দপ্তরের সকল কাজ কিছু কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি কর্মক্ষেত্র কিছু কার্যাবলি নিয়ে গঠিত হয়। আবার কার্যাবলি পরিমাপ করতে চাইলে লাগে কর্মসম্পাদন সূচক। প্রতিটি কার্যাবলির সম্পাদন এক বা একাধিক কর্মসম্পাদন সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয়। প্রতিটি সূচক একটি মান দ্বারা নির্ধারিত। এই সূচকের বিপরীতেই পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলো কি না, তা ষান্মাসিক ও বার্ষিক মূল্যায়নের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। এপিএ এর অন্যতম ইতিবাচক দিক হলো, এতে সকল লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নকারী দপ্তর কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। বিধায় প্রতিটি সূচকের বিপরীতে বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্যমাত্রাই নির্ধারণ করা হয়। একটি অর্থবছর শুরুর পূর্বেই এপিএ প্রস্তুত করা হয় এবং এর জন্যে একটি নির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে।

বর্তমান এপিএ তে কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের জন্যে ৭০ মান ও সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ৩০ মান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড মূলত ৫টি পরিকল্পনার সমষ্টি।

পাঁচটি পরিকল্পনা সংযোজনের মাধ্যমে সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডকে একটি দপ্তরের বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাঁচটি পরিকল্পনা মূল এপিএ এর সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে এবং আলাদা আলাদাভাবে বাস্তবায়িত হবে। আলাদা মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের আনুপাতিক নম্বর এপিএ তে প্রতিফলিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৫০ এ ২৫ অর্জিত হলে এপিএ মূল্যায়নে ১০ এর মধ্যে ৫ পাওয়া যাবে।

এপিএ বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ

যেকোনো চুক্তিতেই দুই বা ততোধিক পক্ষ থাকে। একটি চুক্তি পক্ষগণ কর্তৃক অবশ্য পালনীয়। এপিএ একটি চুক্তি হিসেবে এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক। ২০১৫-'১৬ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়ন শুরু হলেও মাঠ পর্যায়ে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এপিএ

এপিএ—১০০	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র—৭০	
	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র—৩০	শুদ্ধাচার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন—১০
		ইগভর্নেন্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন—১০
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন-৪
		সেবাপ্রদান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন—৩
		তথ্য অধিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন—৩

কর্মপরিকল্পনা	মোট নম্বর	এপিএ-তে ওয়েটেজ
এনআইএস	৫০	১০
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন	৫০	১০
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি	২৫	৩
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	২৫	৪
তথ্য অধিকার	২৫	৩

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জগুলো অনেকটা এরকম—

ক) মাঠ পর্যায়ে এপিএ নিয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকা, এটি বাস্তবায়নের জন্য অন্যতম অন্তরায়। এখনো বিভিন্ন সূচকের পরিমাপজনিত ভুল তথ্যে ভরা রিটার্ন ফাইল পাওয়া যায়। এতে মনে হয়, হয় বাস্তবায়নকারী কার্যালয় এপিএ বুঝতে পারে নাই নতুবা এপিএ এর গুরুত্ব ধরতে পারে নাই।

খ) মাঠ পর্যায়ে এপিএকে Under Evaluate করা হয়েছে। এটি একটি নতুন ধারণা ছিল। নতুন ধারণা মাত্রই হয়তো গ্রহণ করতে সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সুদূরপ্রসারী ধারণা থেকে এপিএ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সারাদেশের সমস্ত সরকারি দপ্তরে কাজের সিস্টেমে অভিন্নতা এনে পারফরমেন্সভিত্তিক মূল্যায়ন করার জন্যেই এপিএ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এপিএ ব্যবস্থাপনা এখন কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থাপনা করার জন্য এপিএ ও এমএস নামক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এমনকি অতিদ্রুতই এপিএ এর মূল্যায়নের ভিত্তিতেই সরকারি দপ্তর ও সরকারি কর্মচারীদের মূল্যায়ন করা হবে। সুতরাং মাঠ পর্যায়ে এপিএকে আন্ডার এভালুয়েট না করে, বরং সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল। এপিএ এর সঠিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গ একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গ) এপিএ প্রণয়নের ক্ষেত্রে রুটিনধর্মী কাজ পরিহার করে ইনোভেশনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রুটিনধর্মী কাজের উপস্থিতি এপিএকে ভারি করে তোলে; বাস্তবায়নের জন্যে চ্যালেঞ্জিং করে তোলে।

ঘ) যেকোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক সংশ্লেষ লাগে। এপিএ টার্গেট থাকার পরেও অনেক সময় অর্থের বরাদ্দ না থাকায় সংশ্লিষ্ট সূচক বাস্তবায়ন করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে।

ঙ) অনেক সময় বাস্তবায়নকারী দপ্তর না বুঝে কোনো কোনো সূচকের বিপরীতে এমন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, তা হয়তো বাস্তবায়ন করা/লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে। তাছাড়া, অন্য কোনো দপ্তর বাস্তবায়ন করবে, তা নিজ দপ্তরের লক্ষ্যমাত্রা রাখা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জিং।

এপিএ বাস্তবায়ন কৌশল

একটি দপ্তর কীভাবে এপিএ নিয়ে ভাববে; কীভাবে বাস্তবায়ন করবে, তা অনেকটাই অফিস প্রধানের ইতিবাচক মনোভাব, দক্ষতা ও বাস্তবায়ন কৌশলের ওপর নির্ভর করে।

ক) এপিএ বাস্তবায়নের জন্যে একটি নিজস্ব প্লান থাকা বাঞ্ছনীয়। অফিস প্রধান এপিএ টিমকে ইফেক্টিভ করতে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তার ওপরেই এপিএ এর সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে।

খ) এপিএ বাস্তবায়ন একক কোনো কাজ নয়। এটি অবশ্যই একটি টিমওয়ার্ক। টিমের প্রতিটি সদস্য নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সক্ষম হলে এপিএ এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

গ) এপিএ এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্যে বাস্তবায়নযোগ্য নির্ভুল এপিএ প্রণয়ন করতে হবে। একটি কথা মনে রাখা জরুরি যে, পরিকল্পনা ভুল হলে লক্ষ্যে পৌঁছানো অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে।

ঘ) এপিএ এর উত্তম বাস্তবায়নের জন্যে দক্ষ এপিএ টিমের কোনো বিকল্প নাই। এর জন্যে ১ দিনের ভাসা ভাসা প্রশিক্ষণ নয়, কমপক্ষে তিনদিনের কর্মশালামূলক আবাসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

শেষ কথা

বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ মতে এটি একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে। এমন একটি মুহূর্তে সরকারের সরকারের নির্বাচনি ইশতাহার, ২০১৮, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০২১-২০২৫, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals 2030) সমূহ প্রতিফলিত হয়েছে এপিএ কার্যক্রমের মাধ্যমে। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এপিএ এর সফল বাস্তবায়ন করা প্রতিটি সরকারি কর্মচারীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত। আগামীকাল থেকে শুরু করব; না ভেবে আজ থেকেই শুরু হোক ভালো।

মোঃ আহসান কবীর: অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও কর্মযজ্ঞ

একটি প্রায়োগিক অনুসন্ধান

হরিদাস ঠাকুর

১. বঙ্গবন্ধু এবং সমবায়

জাতিরপিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় মনস্ক চিন্তক ও প্রয়োগকারী ছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে ধারণ করতেন, লালন করতেন সমবায় চেতনা ও আদর্শ। তিনি পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (পাটগাতী ইউসিএমপিস) এর একজন সদস্য ছিলেন বলে গবেষণায় জানা যায়।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ মানে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন মানে উন্নয়নের দর্শন। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে তাঁর এই উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সমবায় সমিতিতে সম্পৃক্ততা ও সমবায় উদ্যোগ (সমবায় সমিতির সদস্যপদ ও বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে/সমবায় আন্দোলনে বিকাশে উদ্যোগ গ্রহণ) এ কথার সারবত্তা প্রমাণ করে।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে 'ইগালেটারিয়ান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে পাকিস্তানের মতো অভিজাত শ্রেণি গড়ে উঠবে না। ইগালেটেরিয়ান চিন্তা হলো এমন একটি রাজনৈতিক দর্শন যেখানে সব মানুষকে সমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর সবার জন্য সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা হয়। আর সমবায় হচ্ছে এ মহান চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়ণের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। বঙ্গবন্ধুর প্রায়োগিক সমবায় চিন্তা ও দর্শন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।

২. মহান মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে সমবায়ের অবস্থান

১০৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অভীপ্সার চরম বহিঃপ্রকাশ। জাতিরপিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই উন্নয়ন

অভিযাত্রার মহানায়ক। বাঙালির মহাকাব্যিক এই সংগ্রামের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন আমাদের প্রিয় স্বদেশকে স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরের মহামন্ত্র। ঐতিহাসিক এ অভিযাত্রায় আমরা 'সমবায়'-কে দেখতে পাই এক অনন্য অবস্থানে।

২.১ : ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের উত্তাল সময়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় সমবায়

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু উত্তাল সময়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে মূলত স্বাধীন সত্তায় রূপায়িত করেন। এ সময় দেশের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং মুক্তিসংগ্রামকে কার্যকরভাবে সফল করার জন্য বঙ্গবন্ধু জনগণের উদ্দেশ্যে ৩৫টি নির্দেশনা জারি করেন। এ নির্দেশনায় বঙ্গবন্ধু আহবান জানান :

> আজ সমগ্র দেশবাসী তাঁদের সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ; তারা জানাচ্ছেন, সামরিক শাসনের কাছে তারা নতি স্বীকার করবেন না। অতএব আমি সকলের কাছে আবেদন জানাই, বিশেষ করে যাদের কাছে সর্বশেষ সামরিক হুকুম জারি করা হয়েছে, তাঁরা যেন ভীতিপ্রদর্শনের কাছে নত না হন। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের পেছনে রয়েছে। আমি বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের সকল কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সমাধানের উদ্দেশ্যে পঁয়ত্রিশটি নির্দেশনামা জারি করছি। প্রত্যেককে এই নির্দেশগুলো মেনে চলতে হবে। কেউ একে অমান্য করতে পারবে না; করলে শাস্তি পেতে হবে।

দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় ১৫ মার্চ ১৯৭১ সালের সংখ্যা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নতুন কর্মসূচি ঘোষণার কথা জানা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৩৯ থেকে ৭৪৬ নং পৃষ্ঠায় আমরা এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাই। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জারিকৃত পঁয়ত্রিশটি নির্দেশনায় সারাদেশকে অচল করে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম খোলা বা চালু থাকবে এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম বন্ধ থাকবে তা এসব নির্দেশনায় সুস্পষ্ট করা হয়েছিল। জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান/অফিস বা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। পঁয়ত্রিশটি নির্দেশনামার একটি নির্দেশনামা ছিল সমবায় বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু রাখার জন্য।

৩৫টি নির্দেশনার ১৬ নম্বর নির্দেশনার (ঘ) নং দফার সমবায় প্রতিষ্ঠান বিষয়ক নির্দেশনাটি ছিল নিম্নরূপ :

১৬(ঘ) : পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও তার অঙ্গ সংস্থাগুলো থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলো থেকে কৃষিঋণ দেয়া অব্যাহত থাকবে।

২.২ : মুক্তিযুদ্ধকালীন যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সিলেবাসে সমবায়ের উপস্থিতি

মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকেরা ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশের সামগ্রিক একটি রূপরেখা নিয়ে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন সময়ে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম ও টিকে থাকা এবং গ্রামকে স্বয়ম্ভর করার জন্য যুব প্রশিক্ষণের আয়োজন করতেন। এক যুব প্রশিক্ষণের ছিল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সিলেবাস। বাংলাদেশ সরকারের যুবশিবির পরিচালনা বোর্ড এসব যুব প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি ও সিলেবাস (YOUTH TRAINING PROGRAMME, SYLLABUS AND ROUTINE; Issued by Youth Camp Board of Control) প্রণয়ন ও পরিচালনা করতেন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ নির্দেশনা বুকলেটের ৬৭বি দফায় আমরা সমবায়ের উপস্থিতি পাই এভাবে :

YOUTH TRAINING PROGRAMME, SYLLABUS AND ROUTINE

67.B. FUNCTIONS

1(c) : Revive owner- labourer production sharing practice to intensify cooperative labour in all fields.

1(d) : Maximise food production by cooperative labour in the utilization of all land, water, vegetable and animal resources of the village.

এ যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সিলেবাসে আমরা 'স্বাধীন বাংলা সরকার অনুমোদিত গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠামো' শিরোনামে প্রশিক্ষণ প্রেসি/নোট দেখতে পাই। গ্রাম পঞ্চায়েত কাঠামোর আর্থসামাজিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এ রিসোর্স নোটের 'কার্যক্রম' ও অর্থব্যবস্থা' অনুচ্ছেদে আমরা 'সমবায়'-এর উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পাই এভাবে :

কার্যক্রম : এ শিরোনামে ৫টি দফা রয়েছে। এর ১ ও ৫ নম্বর দফায় আমরা সমবায়-এর উপস্থিতি এভাবে পাই :

> গ্রামের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তোলার সকল কাজে, বিশেষত দুর্ভিক্ষ এবং অরাজকতা দমনের কাজে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা গ্রামবাসীর সকল সম্ভাব্য পরিশ্রম এবং সমবায় যতদূর সম্ভব বাড়াতে হবে।
>
> (৫) গ্রামবাসীর সাধ্যমতো পরিশ্রম এবং সমবায়ের সাথে সাথে কৃষি এবং কুটিরশিল্পের সকল ক্ষেত্রে গ্রামে আর কি কি উৎপাদন হতে পারে এবং গ্রামের উৎপাদন দিয়েই কি করে বাইরে থেকে আসা জিনিসের কাজ চলতে পারে সেই উদ্ভাবনা শক্তিও বাড়াতে হবে। যে কোনো বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু খাদ্য এবং সমাজ-শৃঙ্খলাতেই নয়, বস্ত্র, আবাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামের পথ-ঘাট, শরীরচর্চা এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক কৃষ্টির সকল ক্ষেত্রেই অদম্য মনোবলে আত্মনির্ভরশীল গ্রামের জীবনযাপন সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়।

অর্থব্যবস্থা

শ্রম-সমবায় এবং ভাগাভাগি-বিনিময় ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত গ্রাম জীবনে টাকা পয়সার তেমন কোনো প্রয়োজন থাকবে না। দুর্নীতি এবং সামাজিক প্রতারণার বাহন হিসেবে টাকার ব্যবহার যত কমবে ততই মঙ্গল।

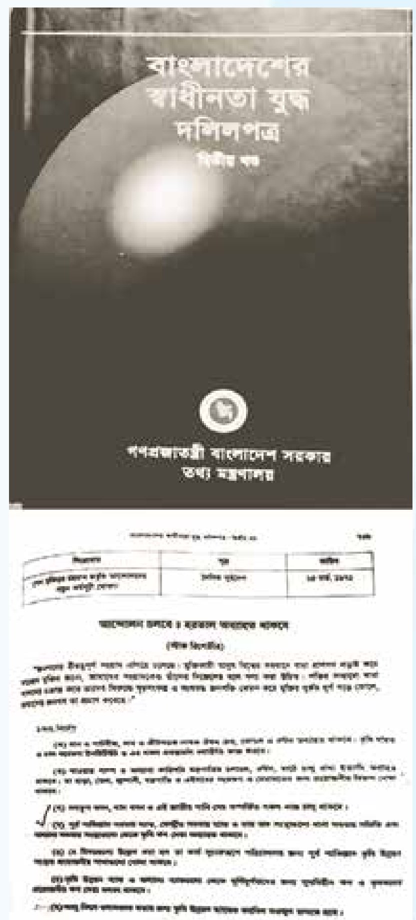

চিত্র-১ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ডে সমবায় সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য

৩. বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এবং কর্ম উদ্যোগ :

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র কথার মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন কাজের মানুষ-কর্মবীর। আজীবন সংগ্রামের

সমবায় ভিত্তিতে চাষ করুন : যশোরে জনতার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু

দেশের সব সম্পদ এখন জনগণের

চিত্র-২ : সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদের জন্য জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আহবান

প্রতিটি পর্বে তিনি কথাকে কাজে রূপান্তর করেছেন নিজস্ব আদর্শ ও চেতনার আলোকে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকেও আমরা পাই কর্মউৎসারক হিসেবে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমবায় সম্পৃক্ততা ও কর্মযজ্ঞ বিশ্লেষণ করে আমরা এর সত্যতা পাই বহুমাত্রিক দ্যোতনায়।

৩.১: সমবায় ভিত্তিতে চাষ করার জন্য বঙ্গবন্ধুর আহবান

বঙ্গবন্ধু সমবায় আন্দোলনকে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করতেন। স্বাধীনতার পরপরই তিনি এ বিষয়ে জনগণকে তৎপর হওয়ার জন্য আহবান জানান। এ ধরনের একটি আহবান সংবলিত প্রতিবেদন আমরা দৈনিক বাংলার ২ এপ্রিল ১৯৭২ সংখ্যায় পাই। পত্রিকার প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ :

সমবায় ভিত্তিতে চাষ করুন : যশোরে জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু।

দেশের সব সম্পদ এখন জনগণের- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পহেলা এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাধিক পরিমাণ জমি চাষের অধীনে আনার জন্য সমবায় ভিত্তিতে কৃষিকাজ করা ও কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আজ কৃষকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। দুইদিনব্যাপী খুলনা সফরের পরে আজ ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে যশোর বিমানবন্দরে উপস্থিত সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, সমস্ত সম্পদ এখন জনগণের। জাতীয়করণসহ বৈপ্লবিক পদক্ষেপের মাধ্যমে শোষণের মূল উৎপাটিত হয়েছে। কৃষকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন যে তারা যেন সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু করে দেয়। তিনি বলেন পাকিস্তানি বর্বর কিছু রেখে যায়নি এবং কর ও খাজনা মওকুফ করার কারণে সরকারের আয় কমে গেছে। সুতরাং সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে তারা যেন অবিলম্বে তাদের কাজ শুরু করে দেয়।

দৈনিক বাংলা

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বাতিল : পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু

স্থানীয় জনগণের নেতৃত্বে সমবায় আন্দোলনে যোগ দিন

বন্যার ডায়েরী থেকে—২

ঢাকা-মস্কো ফোন চালু

চিত্র-৩ : সমবায় আন্দোলনের প্রতি বঙ্গবন্ধু সরকারের দৃঢ় অবস্থানযুক্ত আহবান

৩.২: সমবায় আন্দোলন জোরদারকরণে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় অবস্থান

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সমবায় মনস্ক ও সমবায় বিশ্বাসী একজন উন্নয়ন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি সবসময় বিশ্বাস করতেন সমষ্টিগত শক্তির প্রকাশক 'সমবায়' তাঁর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' নির্মাণের একটি অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে। তাই তিনি সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। এ ধরনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ট্রিবিউন পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে। প্রতিবেদন থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিবরণ পাই :

সমবায় আন্দোলন জোরদার করাই সরকারের নীতি : বঙ্গবন্ধু

কুমিল্লার এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সমবায় আন্দোলন জোরদার করাই তার সরকারের নীতি। তিনি সেটা করতে সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষিদের স্বার্থ রক্ষা এবং জনগণকে সমবায় পদ্ধতি গড়ে তোলার আহ্বানও জানান।

১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে কুমিল্লায় দুই দিনব্যাপী এক সভায় চাষাবাদ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর শুভেচ্ছা বাণীতে আরও বলেন, 'দেশে সমবায় আন্দোলনকে ব্যাপক ভিত্তিতে প্রসারিত করা হচ্ছে। ২৬ এপ্রিলের পত্রিকায় এ সম্পর্কিত খবর প্রকাশ করা হয়। সেই সংবাদে বলা হয়, সরকারের নীতি অনুযায়ী অবিলম্বে একটি গ্রহণযোগ্য কর্মসূচি নেওয়ার বিষয়েও বঙ্গবন্ধু গুরুত্বারোপ করেন। স্বায়ত্তশাসন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী শামসুল হক আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন। সমবায় আন্দোলন হচ্ছে সাধারণ মানুষেরই একটা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর এই উক্তি সম্পর্কে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী শামসুল হক বলেন, 'এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কে একটি পাঁচশালা পরিকল্পনা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় দফতর তৈরি করেছে। ১৯৭৬-'৭৭ সালের মধ্যে পল্লি শিল্পের বিশেষ করে মৎস্য, লবণ, ডেইরি শিল্পগুলো থানা পর্যায় পর্যন্ত সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে জানা যায়।

৩.৩: মহিলা সমবায়ী প্রীতি রাণী দাশকে বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লেখা চিঠি

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২১ নভেম্বর সিলেট সদর উপজেলাধীন কৌড়িয়া পল্লী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর তৎকালীন সম্পাদক প্রীতি রাণী দাশকে নিজ হাতে একটি পত্র লেখেন। উল্লেখ্য যে, প্রীতি রাণী দাশ জাতিরপিতাকে কৌড়িয়া পল্লী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ-এর

সদস্যদের তৈরি তাঁতের কাপড় উপহার দেন। উপহার পেয়ে জাতিরপিতা ভীষণ খুশি হন এবং তিনি নিজ হাতে সমিতির সম্পাদককে চিঠি লেখেন। এ চিঠিতে দেশের উন্নয়নে নারীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং নারী উন্নয়নে তাঁর সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন। আমরা জাতিরপিতার নিজ হাতে লেখা চিঠিটি এখানে তুলে ধরছি :

প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা : ২১ শে নভেম্বর '৭২

শ্রদ্ধেয়া প্রীতি রাণী দাশ

আমার আদাব গ্রহণ করবেন। তাঁত শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ আপনার দেওয়া উপহারখানা জেনারেল ওসমানী সাহেবের মারফতে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি। শিল্প জগতে তাঁত শিল্প এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের উন্নতমানের তাঁত শিল্প একটি গৌরবের বিষয়। দেশের ভাঙ্গা অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রশ্নে আপনাদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। সেহেতু আপনাদের তাঁত শিল্পের ক্রম বিকাশ এবং বিশ্বের হস্ত শিল্পাঙ্গনে এর সুপ্রতিষ্ঠিত স্থান আমার একান্ত কাম্য। সরকার এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাবে। দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনাদের প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতি

শেখ মুজিব

২১/১১/৭২

৩.০৪ : মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এ বঙ্গবন্ধুর অনুদান :

বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এর সঙ্গে আমাদের জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মচেতনা ও দেশপ্রেমের এক অনুপম স্মৃতি জড়িত রয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী সমিতির অফিস ও উৎপাদন কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়। এতে করে সমিতির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লায় আসলে তাঁকে মৃৎশিল্পের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে তিনি সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর থেকে সমিতিকে এককালীন ৭৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। সাথে স্বল্পমূল্যে ২০০ সিএফটি কাঠ এবং প্রয়োজনীয় টিন দেবার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে সমিতির আবার পুনর্জন্ম হয়।

উল্লেখ্য যে, বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ ১৯৬১ সালে ১৫ জন মানবহিতৈষী ব্যক্তি ড. আখতার হামিদ খানের সহযোগিতায় সমিতিটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ সালে সমিতিটি সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধিত হয়। ১৫ টাকার শেয়ার এবং ৭.৫০ টাকা সঞ্চয় সহ মোট ২২.৫০ টাকা মূলধন নিয়ে রুদ্রপাল যাত্রা করে, যা বর্তমানে ২ কোটিতে পৌঁছেছে। বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতিটি ৩ বার জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করে। ২০১৯ সালে সমিতিটি কুমিল্লা জেলার শ্রেষ্ঠ সমিতি হিসেবে সনদ প্রাপ্ত হয়।

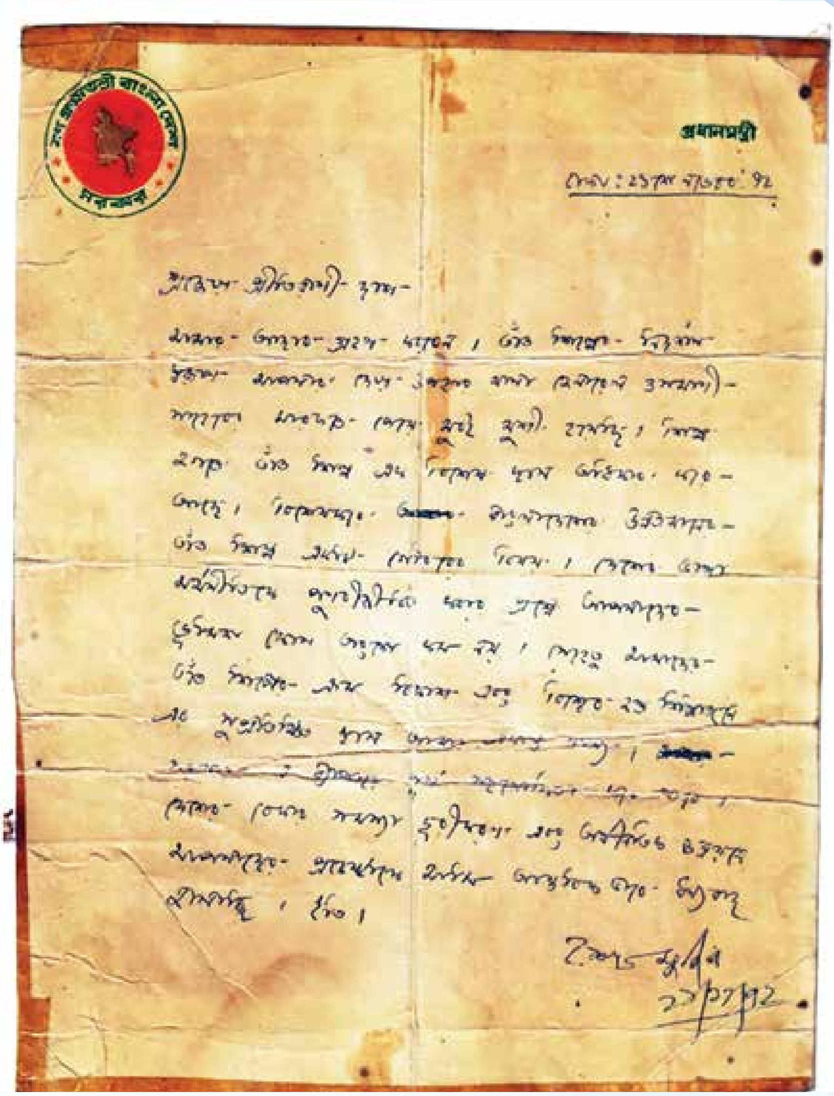
প্রধানমন্ত্রী

চিত্র-৪ : সমবায়ী প্রীতি রাণী দাশকে লেখা বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতের চিঠি। (সৌজন্যে : যুগ্মনিবন্ধক সিলেট জনাব মৃণাল কান্তি বিশ্বাস)

৩.৫ : মিল্কভিটার টেকের হাঁট দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে উপস্থাপিত নথিতে বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরযুক্ত অনুমোদন নোট :

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, কৃষক-শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু, মেহনতি জনতার কণ্ঠস্বর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্যমূল্য এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণির মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতের "আমূল" পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপণের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্ক এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সি ড্যানিডা এর সহায়তায় দুই পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাসট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এদেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দুটির সুপারিশ বিবেচনা করে পূর্বতন কারখানা দুটির দায়-দেনা পরিশোধ করে নতুন এলাকায় সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ

চিত্র-৫ : বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এ বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কিত ব্যানার।

উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় দুটি মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে ১৯৭৭ সালে ''বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড'' নামকরণ করা হয়।

মিল্কভিটার সাথে বঙ্গবন্ধুর ছিল উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ। দুগ্ধ শিল্পের স্বয়ম্ভরতার স্বপ্নের বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু মিল্কভিটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক চলমান 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : প্রয়োগ-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে পাওয়া গেছে।

৩.৬ : বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায় সমিতিতে ঋণের চেক বিতরণ

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে যশোর সার্কিট হাউজে যশোর-৩ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য ও যশোর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব এম রওশন আলীর নিকট যশোর জেলার সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সমবায় চেক প্রদান করেন। [অধ্যক্ষ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি জনাব অঞ্জন কুমার সরকার-এর উদ্যোগে এবং যশোর জেলার সমবায় অফিসার জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হক এর সৌজন্যে ছবি ও তথ্য পাওয়া গেছে।]

৩.৭ : সমবায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুর আশ্বাস

বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে সব সময়ই উৎসাহ দিতেন সমবায়ীদের। ১৯৭৩ সালের ১৯ জুন তিনি ফেনীর মুন্সিহাট খাদি শিল্প সমবায় সমিতির একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। দৈনিক ইত্তেফাক ১৯ জুন, ১৯৭৩ এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় :

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, দেশজ কাঁচামালের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের বিকাশে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে সরকার সব ধরনের সহায়তা দেবে। খবরে বলা হয়, এই দিন (১৯ জুন) সকালে মুন্সিরহাট খাদি শিল্প সমবায় সমিতির একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি এ আশ্বাস দেন। খাদি প্রতিযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপাদিত সুতা দিয়ে তৈরি খাদির কিছু নমুনা প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হয়।

৪. বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও গ্রামভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন—

...বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

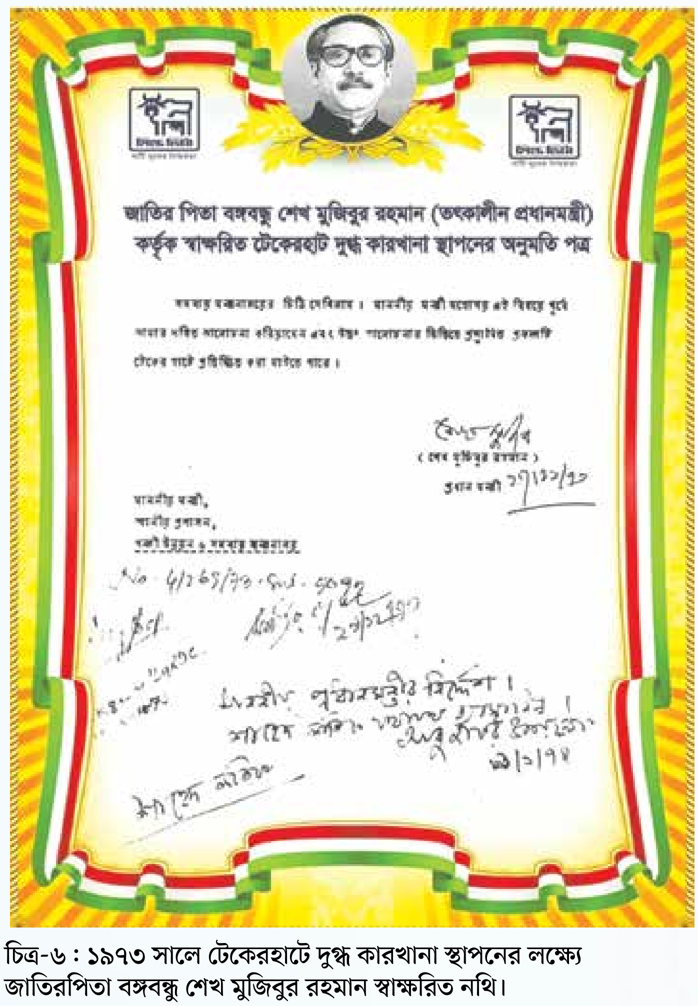
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক স্বাক্ষরিত টেকেরহাট দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের অনুমতি পত্র

চিত্র-৬ : ১৯৭৩ সালে টেকেরহাটে দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত নথি।

চিত্র-৭ : যশোর সার্কিট হাউজে যশোর-৩ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য ও যশোহর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব এম রওশন আলীর নিকট যশোর জেলার সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সমবায় চেক প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু।

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহিদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।

দেশজ উন্নয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভাবনা। কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পকে তিনি সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বেতার টেলিভিশন ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা। তিনি বলেন ''ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সুতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাঁদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণ দানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।'' ছোট ছোট চাষিদের কথাও তিনি বিস্মৃত হননি। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশনে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'ছোট ছোট চাষিদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এ কথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষিরা কেবলমাত্র আধুনিক ব্যবস্থার সুফলই পাবে না বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজশর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে।''

বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাও সুসংহত হয় না। প্রয়োজন রয়েছে সুসম বণ্টন ও সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রেও তিনি সমবায় ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস নেন। ১ মে ১৯৭২ সালে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি তাই বলেন—

আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাব মোচন ও দুর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমতো আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদনকে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ষোলো কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষিদের দশ কোটি টাকার তাকাবি ঋণ, এক লক্ষ নব্বই হাজার টন সার, দু'লাখ মণ বীজ ধান দেওয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। তিনি আরো বলেন ''আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতিমধ্যেই বেসরকারি ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স-পারমিট বাতিল করে দেয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের

দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে।

বঙ্গবন্ধু সমবায়কে দেখতেন নতুন সমাজ-আদর্শ সমাজ-দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তিনি দুর্নীতির কথা জানতেন—দুর্নীতিবাজদের কথা জানতেন—সমাজের পচনের কথা উপলব্ধি করতেন। এর থেকে মুক্তির জন্য তিনি সমবায় পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাইতো ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বলেছিলেন—

আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুস খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্লাক মার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। ...সমাজব্যবস্থায় যেন ঘূণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। ...আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এদিন থাকবে না।... আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বাংলার উন্নয়নে গ্রামে গ্রামে গ্রাম সমবায় গড়তে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের সোপান রচনা করতে চেয়েছিলেন গ্রাম সমবায়ের সফল বাস্তবায়নের দ্বারা। গ্রাম সমবায় গঠনের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ বিষয়ে তার ছিল স্পষ্ট দর্শন ও মনোভাব। গ্রাম সমবায়ের রূপরেখা তিনি স্পষ্টভাবে এঁকেছিলেন। এ বিষয়ে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমরা তাঁর বক্তব্য থেকেই পাই :

কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালী কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, থাক। ওটা চলুক। আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। ...কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ করে শিখতে হবে। সেই জন্য আমার কো-অপারেটিভ। যদি কাজ করে শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন।

৫. বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন এবং দ্বিতীয় বিপ্লব-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। একে তিনি This is our second revolution বা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন। ১৯৭৫ সালের ৬ জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার পক্ষের অন্যান্য রাজনৈতিক দল, শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা প্রমুখকে নিয়ে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, সংক্ষেপে বাকশাল নামে একটি জাতীয় দল গঠন করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সর্বোচ্চ জাতীয় ঐক্য অর্জন। এ জাতীয় দলের ১৫টি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ :

ছয় : সর্বাঙ্গীণ গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও ক্রমান্বয়ে যান্ত্রিকীকরণ এবং সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ প্রচলন।

দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে দুটি দিক ছিল—(ক) সরকার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্মসূচি এবং (খ) আর্থসামাজিক কর্মসূচি।

(ক) প্রথমত ছিল সরকার-পদ্ধতির পরিবর্তন, একটি জাতীয় দল গঠন, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করা, জেলা প্রশাসনের দায়িত্বে জনগণের প্রতিনিধি বা গভর্নর, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার এবং

(খ) দ্বিতীয়ত সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও ভূমিব্যবস্থাপনা, গ্রামে মাল্টিপারপাস বা বহুমুখী কো-অপারেটিভস, পল্লী অঞ্চলে 'হেলথ কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠা, পরিকল্পিত পরিবার এবং শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচিতে ৫টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এগুলো হলো : দুর্নীতি উচ্ছেদ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং জাতীয় ঐক্য।

দ্বিতীয় বিপ্লবের আওতায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছিলেন যার অন্যতম ছিল সমবায় পদ্ধতির চাষাবাদ। এসব পদক্ষেপগুলো হলো :

১. জমির সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ;

২. প্রতিটি থানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ;

৩. পর্যায়ক্রমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ;

৪. কৃষকদের নিকট ফার্টিলাইজার পৌঁছানো;

৫. খাল কেটে কৃষি জমিতে চাষের ব্যবস্থা। পাম্প সরবরাহ না করা পর্যন্ত বাঁধ দিয়ে পানি আটকিয়ে কিংবা কুয়া কেটে সেখান থেকে কৃষিকার্যে পানির ব্যবস্থা করা;

৬. কৃষির ক্রমান্বয়ে যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষি ও শিল্পের প্রসার। উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় কৃষক ও শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা;

৭. সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ। জমির মালিকানা থাকবে এবং কিছুতেই নেওয়া হবে না, বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট তা জানিয়ে দেন। উৎপাদিত ফসলের এক অংশ জমির মালিক, একভাগ কৃষক ও এক অংশ সরকার পাবে। সমবায় হবে কম্পালসারি;

৮. গ্রামে-গ্রামে ৫০০ থেকে ১,০০০ পরিবার নিয়ে মাল্টিপারপাস ভিলেজ কো-অপারেটিভ, ৬৫ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে ৫ বছরে ১টি করে এরূপ বহুমুখী সমবায় স্থাপন। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি কর্মক্ষম মানুষ এর সদস্য হবে। সরকারের কাছ থেকে অর্থ, ফার্টিলাইজার, টেষ্ট রিলিফের বরাদ্দ, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের বরাদ্দ তাদের কাছে যাবে। কৃষি সমবায়ের মতো এর উৎপাদিত পণ্যও জমির মালিক, কো-অপারেটিভের সদস্য ও সরকারের মধ্যে বণ্টিত হবে।এরপর বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য,'আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলে যারা টাউট আছে, তাদেরকে বিদায় দেওয়া হবে।'

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালের বাজেটে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯৭৩-'৭৪ অর্থবছরে বেশকিছু অগ্রগতি সাধিত হয়। এর মধ্যে সমবায় সেক্টরের অর্জন ছিল নিম্নরূপ :

১. ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা তাকাভি ঋণ কৃষি ব্যাংক ও সমবায়ের মাধ্যমে ১৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হয়।

২. পাবনা ও ঢাকার সমবায় দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রের একত্রীকরণ ও সম্প্রসারণের অগ্রগতি সমবায় কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

বঙ্গবন্ধু এমন সমবায়ের কথা ভেবেছেন যা

গ্রামের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করবে, শুধু কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে জড়িতের নয়। সে কারণেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় ছিল 'বহুমুখী' সমবায়। বিভিন্নমুখী তৎপরতা পরিচালনাও এসব সমবায়ের লক্ষ্য ছিল। তিনি গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় তথা গ্রামের বাইরের সব সম্পদও গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে প্রবাহিত করার কথা ভেবেছেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত সমবায়ী গ্রাম প্রস্তাবের পেছনে একদিকে ছিল বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অন্যদিকে ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। বঙ্গবন্ধু নিজে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন এবং বঙ্গবন্ধুর সময়কালে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাজতন্ত্রের যে মডেল বিরাজমান ছিল, তাতে কৃষিতে যৌথচাষভিত্তিক সমবায়কেই যথাযথ বলে বিবেচনা করা হতো। দ্বিতীয় বিপ্লব এবং তার অংশ হিসেবে সমবায়ী গ্রাম কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব বিবেচনা থেকেই বের করেছিলেন।

গ্রামের বিপুল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে একমাত্র সমবায়কে অবলম্বন হিসেবে বঙ্গবন্ধু চিহ্নিত করেন। তিনি দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের উন্নয়নের স্বপ্ন বিনির্মাণে সমবায়ের শক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু দেখান, সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে অনেকের পুঁজির সমন্বয়ে বৃহৎ বিনিয়োগ সম্ভব, যা সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত পুঁজির স্বার্থান্বেষী চক্র, দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট, দেশি বিদেশি চক্র 'দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের' বঙ্গবন্ধুর তত্ত্ব বাস্তবায়ন হতে দেয়নি। তা নাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জনগণের জীবনমান আজ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে গর্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতো।

৬. বঙ্গবন্ধুর 'সমতাবাদী বহুমুখী সমবায় গ্রাম' এর রূপরেখা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী মহাচিন্তক। তিনি সময়ের অগ্রগামী পুরুষ ছিলেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা অবাক বিস্ময়ে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা উপলব্ধি করতে পারি। বর্তমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত খাদ্য চাহিদা, কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, অব্যবহৃত পতিত কৃষি জমি উৎপাদনের বাইরে পড়ে থাকা—এসব সমস্যার কথা আগেই বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু 'গ্রাম সমবায় সমিতি'র পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বর্তমানের অনেক সমস্যার উদ্ভব হতো না বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

গ্রামের আর্থসামাজিক চিত্রে আমুল পরিবর্তন আনাই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্যাস। আধা সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার অবসান বা কৃষিক্ষেত্রে শোষণকে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বরার জন্য, সকল কর্মক্ষম গ্রামীণ জনতার সমবেত শ্রমশক্তিকে উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োজিত করে এবং উৎপাদন উপকরণসমূহকে পূর্ণভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত করে গ্রাম বাংলার দরিদ্র দিন দুঃখী শোষিত কৃষক জনতার মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ''বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায়'' কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল :

(১) পাঁচশত থেকে এক হাজার পরিবার সমন্বয়ে গ্রাম সমবায় গঠন। (২) এই সমস্ত পরিবারের সমস্ত কৃষিজমি সমবায়ের অধীনে ন্যস্তকরণ। (৩) প্রতিটি গ্রাম সমবায় পরিচালনার জন্য সমবায় সভ্যদের ভোটে একটি নির্বাচিত পরিষদ গঠন। (৪) প্রত্যেক কর্মক্ষম ভূমিহীন কৃষক-মজদুর, মালিক-কৃষক বাধ্যতামূলক সমবায়ের সভ্য হবে। (৫) মালিক-কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক-মজদুর সমবায়ের কাজের জন্য নগদ পারিশ্রমিক পাবেন। (৬) সমবায় ক্ষেত খামারে ও অন্যান্যভাবে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে ভাগ করে ভূমি মালিক, ভূমিহীন কৃষক-মজদুর বা সমবায় ও সরকারের মধ্যে বিতরণ। (সরকারের প্রাপ্য অংশ স্থানীয় ধর্মগোলায় রাখতে হবে); (৭) সরকার সমবায়ের কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যাবতীয় উপকরণ বা সাজসরঞ্জাম স্বল্পমূল্যে বা ঋণে বা বিনামূল্যে সমবায়কে প্রদান করবে। (৮) সমবায় সভ্যদের যৌথ চাঁদা বা শেয়ারে গঠিত মূলধনে এবং সরকারের মূলধন ও ঋণে প্রতিটি সমবায়ের অধীনে নানান কুটিরশিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। (৯) সরকার ধর্মগোলায় রক্ষিত সম্পদের মধ্য থেকে একটি অংশ নিয়ে নেবে, বাকি অংশ সমবায়ের নানান দুর্যোগ ও প্রয়োজন মোকাবেলার জন্য জমা থাকবে। (১০) সরকার গ্রাম সমবায় এলাকার আইন-শৃঙ্খলা, রাস্তাঘাট, অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, সেচ, সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধ, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ করবে। (১১) সমবায় তার সভ্যদের প্রদানকৃত শেয়ার মূলধন ও সরকারের ঋণ বা অংশগ্রহণের ভিত্তিতে যেকোনো ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছোট খাট কল-কারখানা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারবে। (১২) প্রতিটি গ্রাম সমবায় উৎপাদন ও প্রশাসনিক ইউনিটরূপে গড়ে উঠবে। (১৩) প্রতিটি গ্রাম সমবায় সমন্বয়ে একটি করে 'আঞ্চলিক সমবায় কার্যালয়' গড়ে উঠতে পারে তবে থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে গ্রাম সমবায়সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। (১৪) আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তারা গ্রাম সমবায়ের পরিচালনা পরিষদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। তবে উভয় কার্যালয়ে সরকারের তরফ থেকে একজন ও জাতীয় দলের থেকে একজন প্রতিনিধি সার্বক্ষণিকভাবে পরিদর্শক হিসেবে থাকবেন। তবে এদের ভোটাধিকার থাকবে না। (১৫) মূলত প্রতিটি গ্রাম সমবায় স্থানীয়ভাবে 'সমবায় সরকার' হিসেবে পরিগণিত হবে। সমবায়ের যাবতীয় নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের দায়দায়িত্ব সমবায় সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকবে। (১৬) সমবায় তথা বিভিন্ন সমবায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিবাদ মীমাংসার জন্য আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ' সমবায় ট্রাইবুনাল' গঠিত হবে।

তিনটি জেলার একুশটি থানা প্লাবিত

মহিলাদের চাকরিতে সমান সুযোগ দিতে হবে

বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং বাহরাইনে ২৪ ঘন্টা আটকে ছিলো

কতিপয় দ্রব্যের উপর প্রস্তাবিত কর প্রত্যাহারের সুপারিশ

চিত্র-৮ : মুন্সিরহাট খাদি শিল্প সমবায় সমিতির একটি প্রতিনিধিদল খাদি প্রতিযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপাদিত সুতা দিয়ে তৈরি খাদির কিছু নমুনা প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেন।

৭. বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলনের বর্তমান উপযোগিতা

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত 'বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায়' কর্মসূচি ছিল একটি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এটি ছিল একটি সময় উপযোগী, চাহিদা উপযোগী ও পরিস্থিতি বা আবহ উপযোগিতার নিরিখে উন্নয়নমুখী ও জনমুখী চিন্তার আলোকে জনবান্ধব কর্মযজ্ঞ। উক্ত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক আর্থসামাজিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন আসতো। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যেসব ইতিবাচক ফলাফল আমরা পেতে পারতাম তার কয়েকটি হলো :

(ক) গ্রাম সমবায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে সমবায় এলাকার সকল কৃষিজমি সমবায়ের ওপর ন্যস্ত হতো। সমবায় এলাকার সকল সাবালক কৃষক-কৃষাণী সমবায়ের সদস্য হতে পারতো এবং সকলে মিলে চাষাবাদ করতো। এ পদ্ধতিতে বর্গাপ্রথা, মজদুর প্রথা উঠে যেত। (খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম প্রদানের জন্য সকলকে একদিকে যেমন পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, অপরদিকে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে জমির মালিকবৃন্দ, কৃষি শ্রমিক বা ভূমিহীন ও সমবায় বা সরকারের মাঝে সমানভাগে ভাগ করা হতো। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব শুরু হতো এবং এর ফলে ব্যাপক জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হতো। (গ) ফসলের উদ্বৃত্তাংশ বিদেশে রপ্তানি করে কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করে দেশকে শিল্পায়িত করা সহজতর হতো। (ঘ) দেশ অনেক আগেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো। (ঙ) বিধিবদ্ধ পুঁজিতে বেসরকারি উদ্যোগে বা ব্যক্তিমালিকানায় ছোটখাট শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদান করা হতো। (চ) ব্যক্তিমালিকানা যাতে তাদের শ্রমিকবৃন্দ ও দ্রব্যসামগ্রীর ক্রেতা সাধারণকে শোষণ করতে না পারে, সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। (ছ) গ্রাম সমবায়ই হতো প্রশাসনের প্রাথমিক ও মূলভিত্তি। (জ) গ্রাম সমবায়ের সার্বিক ক্ষমতা থাকতো জনসাধারণের ওপর। এর ফলে নেতৃত্বের বিকাশসহ জনগণের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হতো। (ঝ) ভূমির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার হতো। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়তো। (একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় পাকিস্তান আমলে এদেশের কৃষকের খণ্ডিত বিভিন্ন জমিতে যে পরিমাণ আইল ছিল তার পরিমাণ যোগ করলে তৎকালীন বগুড়া জেলার আয়তনের সমান হতো। এ চিত্র বর্তমানে পাল্টেনি। বরং আরো প্রকট হয়েছে জমির বিভক্তির ফলে। (ঞ) শুধু উৎপাদন নয়; বরং বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়ও ইতিবাচক এবং গুণগত পরিবর্তন আসতো।

৮. বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে করণীয়

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' কোনো কল্পনা নয়-চরম বাস্তবতা। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিল-২০১৯ অনুসারে—২০১৯ সালে বিশ্বের ৪১তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে ছিল ৪৩তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এশিয়ার অন্য অনেক দেশের মতো আগামী ১৫ বছরে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে বাংলাদেশের। গত এক বছরে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিলের ৪৩তম অবস্থান থেকে ৪১তম অবস্থানে উঠে এসেছে। আগামী ১৫ বছরে বাংলাদেশ ১৯ ধাপ এগিয়ে যাবে। সে হিসেবে ২০২৩ সালে ৩৬তম অবস্থানে, ২০১৮ সালে ২৭তম অবস্থানে এবং ২০৩৩ সালে ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সমবায় অধিদপ্তরকেও সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যেতে হবে। সময়, চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে সমবায় ভাবনাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে দুটি কাজ জরুরি ভিত্তিতে প্রণিধানযোগ্য :

১. সমবায়কে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক সনাতনি সংগঠন না করে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই যাতে নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. বাংলাদেশের সমবায় স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আশীর্বাদ গ্রহণ ও ব্যবহার করে যাতে বাংলাদেশের জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থসামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও কর্মপ্রেরণাকে সমবায় সেক্টরে সম্ভাবনায় পরিণত করতে হবে। নতুন বাস্তবতার আলোকে সমবায়কে গতিশীল ও জনবান্ধব করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. সমবায় সেক্টরে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা ও পণ্য পৌঁছানো যেতে পারে।

২. সমবায়ীদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষায়িত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তোলা যেতে পারে।

৩. 'আন্তঃসমবায় সহযোগিতা'র সমবায় মূলনীতির বাস্তবায়ন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমবায়ীদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এনে উৎপাতি পণ্য ও সেবার লিংকেজ গড়ে তোলা যেতে পারে।

৪. নতুন নতুন ক্ষেত্রে (যেমন : গার্মেন্টস সেক্টর, প্রবাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য পতিত জমিতে কৃষি উৎপাদন, স্কুল কো-অপারেটিভ, টুরিজম কো-অপারেটিভ, হেলথ কো-অপারেটিভ ইত্যাদি) সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে সম্প্রসারণ করে এর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটানো যেতে পারে।

মাননীয় প্রধনমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি. তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেছেন :

সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল। (সমবায় বার্তা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংখ্যা)

সমবায় আন্দোলনকে জাতিরপিতার সমবায় দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় অঙ্গীকারকে পাথেয় করে বাংলাদেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী পরীক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায়কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় এবং এ সংজ্ঞাকে কথা-কাজ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে হবে : সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators).

জাতিরপিতার সমবায় দর্শন ও উন্নয়ন সারাংশ এখানেই নিহিত রয়েছে বলেই সমবায় বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন।

হরিদাস ঠাকুর : উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

প্রসঙ্গ সমবায়

মোঃ জিল্লুর রহমান

প্রযুক্তির মৌলিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর নিরন্তর যাত্রা। নিত্যনূতন প্রযুক্তি, পণ্য ও সেবা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করে চলেছে। পরিবর্তনের ডানায় ভর করে ৪র্থ শিল্পবিপ্লব বদলে দিচ্ছে বিশ্ববাসীর জীবন ও সংস্কৃতি।

'৪র্থ শিল্পবিপ্লব' শব্দটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন একদল বিজ্ঞানী, যারা জার্মান সরকারের জন্য একটি উচ্চ প্রযুক্তিগত কৌশল তৈরি করছিলেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান ক্লাউস শোয়্যাব ২০১৫ সালে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে প্রকাশিত একটি নিবন্ধের মাধ্যমে ৪র্থ শিল্পবিপ্লব শব্দটিকে বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপন করেন। শোয়্যাব তখন এমন সব প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও বায়োলজিকে (সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেমস) একত্র করে পৃথিবীকে উন্নতির পথে আরো গতিশীল করা যায়। শোয়্যাব আশা করেন, যুগটি রোবোটিক্স বুদ্ধিমত্তা, ন্যানোটেকনোলজি, কোয়ান্টামকম্পিউটিং, বায়োটেকনোলজি, ইন্টারনেট অব থিংস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অব থিংস, ডিসেন্ট্রালাইজড কনসেনসাস, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিং ও সম্পূর্ণ স্বশাসিত যানবাহনের ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রযুক্তির যুগান্তকারী যুগ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ইতোমধ্যে ক্লাউস শোয়্যাব চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন যা সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে আলোচিত ও পঠিত। বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। ক্লাউস শোয়্যাবের ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের ভাবনার কিয়দাংশ এ অনুবাদ গ্রন্থ থেকে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

অসমতা একটি পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ

৪র্থ শিল্পবিপ্লব একদিকে যেমন ব্যাপকভাবে কল্যাণকর হবে, অন্যদিকে তেমনি বড় বড় চ্যালেঞ্জেরও সৃষ্টি করবে। মাত্রাতিরিক্ত অসমতা একটি বড় উৎকণ্ঠার বিষয় বটে।

...ইন্টারনেট, স্মার্টফোন এবং হাজার হাজার অ্যাপস আমাদের জীবনযাপনকে সহজ ও অনেক বেশি উৎপাদনশীল করে দিচ্ছে।

...৪র্থ শিল্পবিপ্লব মূলত যোগানের দিকে অর্থাৎ কর্মজীবন ও উৎপাদনেই বেশি চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করছে বলে মনে হয়।

ফলে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের উপকারভোগীরা হলেন বুদ্ধিবৃত্তিক ও ভৌত পুঁজির যোগানদার অর্থাৎ উদ্ভাবনকারী, বিনিয়োগকারী ও শেয়ার মালিক। মূলধনের মালিক ও শ্রমজীবীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্যের এটিই কারণ।

...খুবই স্বল্পসংখ্যক মানুষের হতে যাবতীয় সুবিধা এবং মূল্যায়ন কেন্দ্রীভূত হওয়াটা তথাকথিত প্লাটফর্ম ইফেক্টের একটি কুফল নিশ্চয়ই। প্লাটফর্ম ইফেক্টের পরিণতি হলো বাজারে গুটিকয়েক কিন্তু এর আধিপত্য হলো শক্তিশালী।

...আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে পালনীয় কতগুলো মূল্যবোধ সৃষ্টির নিশ্চয়তা দেওয়া, যা দিয়ে একটি নীতিকৌশল প্রণয়ন করে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবকে সবার জন্যই একটি সুযোগে পরিণত করা সম্ভব হবে।

চালিকাশক্তি

অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রযুক্তিকে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চালক হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

দৃশ্যমান

প্রযুক্তিগত মহাপ্রবণতার চারটি প্রধান দৃশ্যমান বিধিবদ্ধতা রয়েছে :

- স্বয়ংক্রিয় যানবাহন
- ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ
- অগ্রগামী রোবোটিকস
- নতুন নতুন উপকরণ

...প্রকৃতপক্ষে একজন বাস্তববাদী ও আশাবাদী মানুষ হিসেবে আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ৪র্থ শিল্পবিপ্লব সৃজিত যে ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে আসতে পারে, তা আমরা মাত্র উপলব্ধি করতে শুরু করেছি। আমাদের আশাবাদের তিনটি কারণ :

...প্রথমত, ৪র্থ শিল্পবিপ্লবেই অন্তর্নিহিত রয়েছে বিশ্বের ২০০ কোটি মানুষের অপূরণকৃত প্রয়োজন বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার সুযোগ। ফলে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ও জনগণের অতিরিক্ত চাহিদা শক্তি বর্তমানে যোগান দেওয়া পণ্য ও সেবা খাতে ইতিবাচক

চাপ সৃষ্টি করবে।

...দ্বিতীয়ত, ৪র্থ শিল্পবিপ্লব নীতিবাচক বাহ্যিকময়তা বা নেগিটিভ এক্সটারনালিটিজকে চিহ্নিত করার সক্ষমতাকে অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়।

...তৃতীয়ত, আমরা মাত্রই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের শুরুতে আছি, এর পূর্ণ সুফল ঘরে তুলতে সম্পূর্ণ নতুন অর্থনৈতিক এবং কাঠমোগত ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে।

স্বয়ংক্রিয় হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির কর্মক্ষেত্র :

- টেলিমার্কেটাস
- ট্যাক্স প্রস্তুতকারক
- বিমাদাবি মূল্যায়নকারী ও স্বয়ংক্রিয় ক্ষয়ক্ষতি
- আম্পায়ার, রেফারি ও অন্যান্য ক্রীড়া কর্মকর্তা
- আইন সচিব
- রেস্টুরেন্ট, লাউঞ্জ ও কফিশপের হোস্ট
- রিয়েল এস্টেট দালাল
- কৃষিশ্রমের ঠিকাদার
- আইনি, ওষুধ ও নির্বাহী ছাড়া সাচিবিক ও প্রশাসনিক সহকারী
- কুরিয়ার ও বার্তাবাহক

স্বয়ংক্রিয়তার সবচেয়ে কম ঝুঁকিতে থাকা কর্মক্ষেত্র :

- মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার রোধ বিষয়ে সমাজকর্মী
- কোরিওগ্রাফার্স
- ডাক্তার ও সার্জন
- মনোরোগ চিকিৎসক
- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক
- কম্পিউটার সিস্টেম বিশ্লেষক
- নৃতত্ত্ববিদ ও পুরাকীর্তিবিদ
- মেরিন প্রকৌশলী ও নোভাল আর্কিটেক্ট
- বিপণন ব্যবস্থাপক
- প্রধান নির্বাহী

৪র্থ শিল্পবিপ্লব ও সমবায়

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা অনুযায়ী দেখা যায় যে, আগামী দুই দশকের মধ্যে মানবজাতির ৪৭ শতাংশ কাজ স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমনির্ভর এবং অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতানির্ভর চাকরি বিলুপ্ত হলেও উচ্চ দক্ষতানির্ভর যে নতুন কর্মবাজার সৃষ্টি হবে, সে বিষয়ে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে তার জন্য প্রস্তুত করে তোলার এখনই সেরা সময়। দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করা সম্ভব হলে জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্য অনেক দেশ থেকে অনেক বেশি উপযুক্ত।

'সমবায়' আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলেও প্রযুক্তির ব্যবহারে সমবায় অনেক পিছিয়ে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমবায় সেক্টরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন—

ক) কম্পিউটার ও ইন্টারনেটভিত্তিক ৩য় শিল্পবিপ্লবের পরিবর্তনের সাথে সমবায় এখন কাঙ্ক্ষিত মানে খাপ খাওয়াতে পারেনি। জরুরিভিত্তিতে সমবায় সমিতিতে হিসাব সংরক্ষণ ও ডাটাবেজের জন্য সফটওয়্যার ব্যবহার করা প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমবায় সমিতির তদারকি কৌশলও ডিজিটালভিত্তিক হওয়া আবশ্যক।

খ) ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের কারিগরি ও উৎকর্ষ রূপান্তর থেকে আমরা অনেক দূরে। সমবায় ও সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম এবং শ্রমবাজার কী ঝুঁকি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার মুখোমুখি হবে সেসব বিষয়ে কার্যকর ও নিরন্তর গবেষণা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এ গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

গ) সমবায় সমিতিগুলোকে জানতে হবে কোথায় সম্ভাবনা বাড়বে, কোথায় বর্তমানের অর্জনগুলো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। আর সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে।

ঘ) ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের অভিঘাত মোকাবেলায় কারিগরি দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। সমবায় সেক্টরে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সমবায়ীদেরকে উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। সমবায়ীদেরকে প্রশিক্ষিত করার একটি অন্যতম সুযোগ এটি। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি যন্ত্র ও জ্ঞানে সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। উন্নত বাংলাদেশ গঠনে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে প্রধান ভূমিকা পালন করবে। সরকারের নীতি ও কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক।

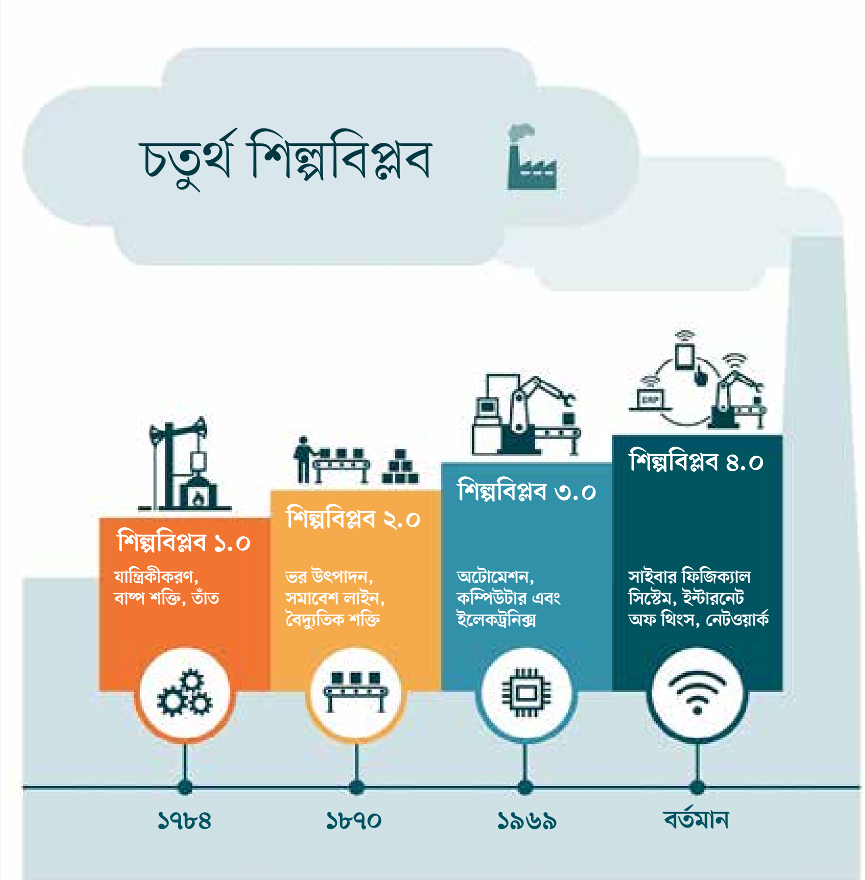

মোঃ জিল্লুর রহমান : যুগ্মনিবন্ধক

সমবায় সমিতির আর্থিক ব্যবস্থাপনার নানা দিক

মাঠশিক্ষা

মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন

শুরুর কথা

সমবায় সমিতি মূলত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। আর্থিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি একটি সমবায় সমিতি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকে। আমরা সমবায় সমিতির সংজ্ঞার দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাই, সমবায় সমিতি এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা সমমনা কমপক্ষে ২০ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এবং সমবেত মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক উন্নতিসাধন করা হয়। অন্যদিকে আইনগত দিক থেকে সমবায় সমিতি একটি গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এখানে ৬/৯/১২ সদস্যের একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গনতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে সমিতির আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যেহেতু একটি কমিটি সমিতির সকল সদস্যের পক্ষে সমিতির আর্থিক কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে, সেই হেতু কমিটি বার্ষিক সাধারণ সভার নিকট সকল জবাবদিহিতার জন্যে দায়বদ্ধ।

সমবায় সমিতির আর্থিক ব্যবস্থাপনা

একটি সমবায় সমিতির আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলতে আসলে কি বুঝায়? কি কি ধরনের কাজ মূলত আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভূক্ত? সে প্রশ্নের জবাবের আগে ফিরতি প্রশ্ন হলো, সমবায় সমিতির এমন কোনো কাজ কি আছে যার সাথে আর্থিক সংশ্লেষ নেই? যদি না থাকে, তাহলে বলা যায়, সমবায় সমিতির কর্মকাণ্ডই মূলত আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতাভূক্ত। যা দরকার, তাহলো—এই আর্থিক ব্যবস্থাপনা যেন দুর্নীতির উর্ধে হয়, জবাবদিহিতামূলক হয়, অংশগ্রহণমূলক ও কল্যাণকর হয়। তাহলে এক কথায়, সমবায় সমিতির আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলতে মূলত শেয়ার-সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন করা, সেই মূলধন বৈধ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা, সকল আর্থিক লেনদেনের (অন্তপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ) নিয়ন্ত্রন করা, আর্থিক লেনদেনের আইনগত ভিত্তি অনুসরণ করা এবং যুতসই পদ্ধতি অনুসরণ করা, লাভ/ক্ষতি শেষে তার বণ্টন এবং অডিট ও বার্ষিক সাধারণ সভার কাছে জবাবদিহিতার জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখাকে বুঝানো যেতে পারে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

১. মূলধন গঠন

সমবায় পদ্ধতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমবেত পুঁজি গঠন করা। একটি সমবায় সমিতির পুঁজি মূলত দুই ধরনের; নিজস্ব ও ধারকৃত। সমবায় সমিতি মূলত এ পুঁজি গঠন করে শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে। সমবায় সমিতির আইনমতে একজন সদস্য মোট অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের ২০% এর বেশি ক্রয় করতে পারবে না। তবে সঞ্চয়/আমানত বাড়ানোর ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিধিনিষেধ নেই। সদস্য ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে এই আমানত গ্রহণ করা আইনবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড। এসব মূলত ধারকৃত মূলধন। এর বাইরে ব্যংক থেকে সমিতি ধার করতে পারে, কেননা একটি সমবায় সমিতি একটি Body Corporate হিসেবে কাজ করবে। পুঁজি গঠন সংক্রান্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে যে অসামঞ্জস্য দেখতে পাই তাহলো, সমিতি তার মূলধনের প্রায় শতভাগ ঐ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে হাওলাত হিসেবে গ্রহণ করে, যার কোনো চুক্তিপত্র সমিতি কার্যালয়ে পাওয়া যায় না, ফলে লাভের প্রায় শতভাগ ঐ পাওনাদারদেরকে দিয়ে দিতে হয়। সমিতির সাধারণ সদস্যরা মূলত ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হয়। এসকল সমবায়ের সাথে এনজিও কার্যক্রমের মূলত কোনো প্রভেদ নেই। অথচ সমবায়কে আমরা স্থানীয় ব্যাংক বলে থাকি, যেখানে প্রতিটি সদস্য তাদের শেয়ারক্রয়ের মাধ্যমে পুজি গঠন করবে এবং বছর শেষে লভ্যাংশ পাবে। একটি কথা স্পষ্ট করতে চাই যে, মাত্র ৩/৬ ব্যক্তির অর্থ বিনিয়োগের (মূলত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে) সাথে সমবায়কে গুলিয়ে ফেললে তা সবসময়ের জন্যে ভুল বার্তা বহন করবে। আরেকটি বিষয়

লক্ষ্যনীয় যে, সমবায়ের মূলধন কখনোই রাতারাতি গড়ে তোলা যায় না। এর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। যারা সময় নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শেয়ারের মাধ্যমে নিজেদের পুঁজি গঠন করে এবং উপযুক্ত বিনিয়োগ করে, তারাই টেকসই সমবায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

২. মূলধনের বিনিয়োগ

সমবায়ের মাধ্যমে গঠিত পুঁজি কোন খাতে বিনিয়োগ করা যায়? অথবা কোন খাতে বিনিয়োগ করা উত্তম হবে? এ প্রশ্নের উত্তরের পূর্বেই আমরা সরেজমিন থেকে ঘুরে আসতে চাই। সাধারণত পুঁজি বিনিয়োগ বলতে মাঠে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগকে বুঝিয়ে থাকে। ১০০ সমিতির মধ্যে ৯৯ ই পাওয়া যাবে যারা মূলত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। আইন বিধিতে উল্লেখ করা আছে, বৈধ নয়, এমন যেকোনো খাতে সমবায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে। মূলত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আমরা সমবায়ের অন্যান্য অপার সম্ভাবনাকে খুন করছি দিনের পর দিন। অথচ সংগৃহীত পুঁজি আমরা সমবায়ের মালিকানায় কৃষি খাতে, শিল্প খাতে, পর্যটনখাতে, পরিবহন খাতে, জ্বালানি খাতে, সেবা খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে সমবায় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারি। বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ লভ্যাংশ আকারে সকল সদস্যের মধ্যে বন্টিত হয়ে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে। উদাহরণ: কিংশুক, বাঘাবাড়িঘাট ট্যাঙ্কলরি সমবায় সমিতি পরিবহন/পর্যটন খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ রয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমেও সঠিক মনিটরিং করা হয় না। ঋণপ্রদানকৃত অর্থ ফেরত আনা নিয়েই বেশি ভাবা হয়। কিন্তু Productive খাত চিহ্নিত করে ঋণ বিনিয়োগ করলে এবং নিয়মিত মনিটনিং এর আওতায় রাখলে গৃনগ্রহীতা ও সমবায়; উভয়ই লাভবান হতে পারে। একটি কথা স্পষ্ট করা দরকার, সমবায়ের মূলধনের কল্যাণমুখী বিনিয়োগের জন্যে চাই সঠিক ও দূরদর্শী পরিকল্পনা।

৩. সমিতির হিসাব সংরক্ষণ করা

সকল আর্থিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, আইন-বিধির আলোকে হতে হবে। নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি অবশ্যই সকল আয়-ব্যয় বা লেনদেনের তথ্য যথাযথ ও সততার সাথে সংরক্ষণ করবে। এই সংরক্ষণ পদ্ধতি ডিজিটাল বা এনালগ যেকোনো উপায়েই হতে পারে। হিসাব সংরক্ষণের জন্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে পারে অথবা ডিজিটালি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে পারে। এতে ধরা বাধা কোনো নিয়ম থাকা উচিত নয়। হিসাব সংরক্ষণের কাজটি যথাযথভাবে করা সম্ভব হলে, সমবায়ের মধ্যে স্বচ্ছতা যেমন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, তেমনি ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। মনে রাখতে হবে, এখানে সকল সদস্যের কষ্টে অর্জিত টাকা গচ্ছিত আকারে রয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির অস্বচ্ছতার কারনে যদি সদস্যদের আর্থিক ক্ষতি হয়, তবে সেই ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় আইনের চোখে অপরাধী এবং সমবায় আইনে দোষী ব্যক্তিদের কমিটি থেকে বহিষ্কারের বিধান রয়েছে।

সমবায়ের সকল হিসাব সংরক্ষণ ও বৎসরশেষে সমবায় সমিতির বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা ঐ সমবায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর বর্তায় এবং এ কাজটি সমবায় আইন-বিধি দ্বারা নির্ধারিত। সমবায় সমিতির লেনদেনের একটি বৎসর শেষ হয় জুন মাসে। জুলাই মাসের ৩০ তারিখের মধ্যেই ব্যবস্থাপনা কমিটির উচিত, সমিতির সমাপ্ত বতসরের বার্ষিক হিসাব বিবরনী নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা। এতসব ছাইপাশ আলোচনার আগে আমাদের জানা দরকার, সমবায় সমিতির বার্ষিক হিসাব বিবরণী বলতে আসলে কি বুঝায়? এটি মূলত চারটি হিসাবের সমষ্টিগত নাম—ক) নগদান হিসাব খ) লাভ-ক্ষতির হিসাব গ) লাভ ক্ষতির বণ্টন হিসাব ঘ) উদ্বৃত্ত পত্র। সমবায় সমিতির বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিলের পর মূলত এই বার্ষিক হিসাব বিবরণী সঠিকতা যাচাই করাই অডিটিং এর কাজ।

৪. অডিটিং কার্যক্রম

প্রায়ই দেখা যায়, সমবায় সমিতির মধ্যে অডিটিং নিয়ে ভীতি কাজ করে যা সম্পূর্ণ অমূলক। সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা থাকা জরুরী। একটা সমবায় বছর শেষ হলে নতুন বছরের শুরু হয়। পুরানো হিসাব নিকাশ যাচাই করে বার্ষিক হিসাব বিবরনী প্রস্তুত করে অডিটিং এর জন্যে প্রস্তুত থাকা দরকার। আমি মনে করি, প্রতি সমবায় বছরের একদম শুরুতেই অডিটিং কাজ সম্পন্ন করা দরকার। একটি সমবায় সমিতির অন্যান্য সকল কাজ অডিটিং কার্যক্রম এবং অডিটনোটের ওপর নির্ভর করে। অডিটিং শেষে সমিতির লাভ ক্ষতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। শেষ হওয়া বছরে সংঘটিত আর্থিক কার্যক্রমের ভুলত্রুটি ধরা পড়ে এবং তা সংশোধনী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অডিট শেষ হয়ে যাবার পর এজিএম কাজ সম্পাদন করা হয় এবং লভ্যাংশ বণ্টন করা। সুতরাং অডিটিং কাজ যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করার জন্যে প্রস্তুত থাকা একটি উত্তম ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈশিষ্ট্য।

৫. লাভ ক্ষতির বণ্টন

অডিটশেষে একটি সমিতির প্রকৃত আর্থিক চিত্র পাওয়া যায়। বুঝা যায়, সমিতিটি লাভজনক কিনা! লাভজনক হলে সেই লাভের আইন-বিধিগত বণ্টনের কাজ সম্পন্ন করা দরকার। লভ্যাংশ বণ্টন করা জরুরী। এতে সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে Ownership তৈরি হবে।

শেষকথা

আর্থিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সমবায় সমিতির সকল কর্মকাণ্ডই মূলত আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতাভূক্ত। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সততা-নিষ্ঠার সাথে জবাবদিহিতার মধ্যে থেকে এসকল আর্থিক ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করা প্রতিটি ব্যবস্থাপনা কমিটির গুরু-দায়িত্ব।

মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন: অধ্যক্ষ-উপনিবন্ধক, আসই, নওগাঁ।

পাহাড়ের জনপদে একটি আলোকিত নাম 'বারেং মহিলা সমবায় সমিতি'

রত্ন কান্তি রোয়াজা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা শহরের পানখাইয়া পাড়ায় যাওয়ার পথে স্লুইস গেইট এলাকায় বারেং মহিলা সমবায় সমিতির কার্যালয় অবস্থিত। সমিতির নিজস্ব ভবন না থাকায় ভাড়াটিয়া কার্যালয়ে সমিতির দৈনন্দিন কার্যক্রম ও কারখানা পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৭ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে এই সমিতির কার্যক্রম শুরু হয়। সমিতির সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় আমানতের অর্থ দিয়েই কারখানা চালু করা হয়। এই কারখানায় সমিতির সদস্যগন নিজেরাই উল বুনন করে সোয়েটার, চাদর, খাদি, থামি, মাফ্লার ও শীতকালীন পোশাক তৈরি করে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও সমিতিতে টেইলরিং কাজ চালু আছে এবং সমিতির সদস্যদের সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে করে সমিতির অনেক সদস্য প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের টাকায় সেলাই মেশিন ক্রয় করে নিজস্ব ঘরে সেলাই এর কাজ করে আয়-রোজগার করার সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে সমিতির অধিকাংশ সদস্য সমিতিতে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করায় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ ঘরে শীতকালীন পোশাকসহ সোয়েটার নিজ হাতে তৈরি করে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই সমিতির নিবন্ধন নং-১৪/খাগড়া তারিখ-২৪/০৭/২০১৭। বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ২২ জন। সমিতির সদস্যগণ নিয়মিতভাবে সঞ্চয় আমানত প্রদান করে।

সমিতির সিদ্ধান্তানুযায়ী প্রতিমাসের ১ তারিখ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে সঞ্চয় জমা প্রদান করিতে হয়। বর্তমানে সমিতির আদায়কৃত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে শেয়ার ২২,০০০ টাকা ও সঞ্চয় ৪১,২০০ টাকা। বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধন ৬৩,২০০ টাকা।

এই সমিতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক সমবায় বিভাগকে প্রদত্ত ঘূর্ণীয়মান তহবিল খাত হতে মং-৫০,০০০ টাকা কর্জ গ্রহণ করে এবং উক্ত সমুদয় সুদাসল টাকা পরিশোধ করে পুনরায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মং-১,২০,০০০ টাকা কর্জ গ্রহণ করে। গৃহীত কর্জের টাকায় উল বুননের জন্য সুতা ক্রয় করে। সমিতির কারখানায় উক্ত সুতা দিয়ে সোয়েটার, চাদর, থামিসহ বিভিন্ন কারুকার্য খচিত গায়ের চাদর ও খাদি তৈরি করা হয়। সমিতির নিজস্ব বিপণীবিতান না থাকায় উৎপাদনকৃত পণ্যসমূহ পাইকারী মূল্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় করা হয়।

এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল—সদস্যদের সঞ্চিত অর্থকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন। আর সেই লক্ষ্য অর্জনে সমিতি কাজ করে যাচ্ছে। ফলে সমিতির প্রত্যেক সদস্য উৎপাদন কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও এই কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

সমবায় সমিতি আইনের ১৭ ধারায় প্রতি বছর সমিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ সাধারণ সভা করা হয়ে থাকে। সমবায় বিধিমালার ৪২/২ বিধিমতে প্রতিমাসে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করা হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সমিতির উন্নয়নে তাদের কাছ থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ চাওয়া হয়।

নারী ক্ষমতায়ন করতে হলে কাজের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং প্রতিটি সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে। কর্ম ও যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব

এই সমিতির নির্বাচন বিগত ২৩/০৪/২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতিতে গোপন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নির্বাচন করা না হলেও সমবায় সমিতি আইনের ১৮ ধারা অনুসরণ করে বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের উপস্থিতিতে আলোচনা সাপেক্ষে কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে।

এই সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক জেলা সমবায় কার্যালয়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, ফেনী এবং বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লায়— ক্রিস্টাল শো-পিস ও মাশুরুম (আইজিএ) ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তাছাড়াও সমিতির ১০ জন সদস্য স্থানীয়ভাবে সেলাই ও মাশুরুম চাষের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে সমিতির তহবিল থেকে কিছু সদস্যকে সেলাই মেশিন ও পণ্য উৎপাদনের জন্য বিনাসুদে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমিতি ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করবে মর্মে—প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সমিতির সভাপতি এই আশাবাদও ব্যক্ত করেন যে, নারী ক্ষমতায়ন করতে হলে কাজের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং প্রতিটি সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে। কর্ম ও যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব। তাই তিনি এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ যেন প্রাধান্য পায়—সে ব্যাপারে সমিতির মাধ্যমে কাজ করে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাদের মতে— এই সমিতির মূল লক্ষ্য একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। তাদের সকলের কণ্ঠে এক বাক্যে উচ্চারণ আর সেটা হলো— এক সাথে করবো কাজ—সুখে থাকবো বার মাস।

রত্ন কান্তি রোয়াজা : প্রাক্তন সমবায় কর্মকর্তা

একটি সম্ভাবনাময় সমবায় সমিতির পরিক্রমা

মোঃ নাসির উদ্দীন

রাজশাহী জেলার 'পুঠিয়া উপজেলা' ইতিহাস ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অন্যতম স্থান হিসেবে পরিচিত। এখানে উল্লেখ করা যায় তদানীন্তন ভারত বর্ষের জমিদার বংশগুলোর মধ্যে পুঠিয়ার জমিদার বংশ প্রাচীন ও অন্যতম জমিদার বংশ হিসেবে ইতিহাসখ্যাত। এই জমিদার বংশের উদ্ভব ঘটে মুঘল সম্রাট আকবরের শাসন আমলে এবং ১৯৫১ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান শাসনামলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে পুঠিয়া জমিদার বংশের অবসান ঘটে।

পুঠিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সম্রাট আকবরের আমলে। বৎসরাচার্য নামে এক ঋষিপুরুষ বাদশাহী সূত্রে লাভ করেন পুঠিয়া রাজ্যের জমিদারি। যিনি পুঠিয়া রাজবংশের আদি রাজা নামে পরিচিত। তারও পূর্বে বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্গত এ উপজেলা পুঠিমাড়ীর বিল নামে পরিচিত ছিল মর্মে জানা যায়। এ থেকে এ উপজেলার নাম পুঠিয়া হয়েছে। আবার স্থানীয় এলাকাবাসীর সাথে আলাপে জানা যায় যে, পুঠিয়া রাজাদের এক আশ্রিতা ছিল তার নাম ছিল পুঠিবিবি। তিনি রূপে গুণে বুদ্ধিমতী এবং অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। যা বলতেন তাই ঠিক ঠিক ফলে যেত। নীলকুঠিদের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার আগে বলেছিলেন জয় হবে, সত্যিই জয় হয়েছিল। তখন পুঠিয়া রাজবংশের রাজাগণ বললেন তুমি কি চাও, যা চাইবে তাই পাবে। তখন পুঠিবিবি বলেছিল আমাকে এমন কিছু দেওয়া হোক যা এলাকার মানুষ যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে। তখন পুঠিয়া রাজবংশের রাজাগণ একমত হয়ে তার ইচ্ছা পূরণার্থে তারই নামানুসারে এই এলাকার নাম রাখেন পুঠিয়া। যা পরবর্তীতে পুঠিয়া উপজেলা হিসেবে নামকরণ হয়, পুঠিয়া নামকরণে বিভিন্ন ইতিহাস তথা জনশ্রুতির মধ্যে এটি অন্যতম।

পুঠিয়া উপজেলার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ

পুঠিয়া রাজবাড়ী, গোবিন্দ মন্দির, ছোট আহ্নিক মন্দির, ছোট শিব মন্দির, দোল মন্দির, বড় শিব মন্দির, জগন্নাথ রথ মন্দির, চারআনি জমিদারবাড়ী, বড় আহ্নিক মন্দির, ছোট গোবিন্দ মন্দির, গোপাল মন্দির, হাওয়াখানা, কৃষ্ণপুর মন্দির, খিতিশ চন্দ্রের মঠ , কেষ্ট খেপার মঠ ইত্যাদি।

চিত্রণ : 'এদেশে প্রত্যেক মানুষ শিক্ষা, খাদ্য, আশ্রয় ও উন্নতভাবে যেন বেঁচে থাকে, তাই প্রত্যেক গ্রামে, শহরে, জেলায় মাল্টিপারপাস সমবায় সমিতি তৈরি করার চিন্তা বঙ্গবন্ধুর দর্শন তথা স্বপ্ন ছিল' তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। তিনি চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া দেশব্যাপী সমবায় সমিতিগুলো যেমন—বহুমুখী সমবায় সমিতি, গৃহায়ন সমবায় সমিতি, যুব সমবায় সমিতি, মহিলা সমবায় সমিতি, মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি, তাঁতি সমবায় সমিতি, কৃষক সমবায় সমিতি, দিনমজুর তথা শ্রমিক সমবায় সমিতিসহ আরো অনেক সমবায় সমিতি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। তন্মধ্যে পুঠিয়া-দুর্গাপুর থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এর নাম বলাবাহুল্য। এ সমবায় সমিতিটি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে নব রবির প্রথম কিরণের আভা ছড়িয়ে দীপ্ত করে চলেছে তার অস্তিত্বকে। এ সমবায় সমিতির কার্যক্রম দৃশ্যমান না হওয়ার ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উতরাই এর সংক্ষিপ্ত চিত্রণ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

পুঠিয়া-দুর্গাপুর থানা কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর নিজস্ব অফিস ভবন

নিবন্ধন, সদস্য সংখ্যা, সভ্য নির্বাচনি ও কর্ম এলাকা

পুঠিয়া উপজলার পুঠিয়া ইউনিয়নের চারআনি বাজারে অবস্থিত একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান, যার নাম—পুঠিয়া-দুর্গাপুর থানা কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার মাত্র ৩০টি সমবায় সমিতির ইউসিএমপিএস, কৃষি ও বহুমুখী সমবায় সমিতির প্রায় ৬৪৪ জন কৃষক ও হতদরিদ্র জনগণ তাদের নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের তথা শেয়ার, সঞ্চয় আদায়, মূলধন গঠন এবং সুলভ সার, সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে সমবেতভাবে ১৯২১ সালে পুঠিয়া দুর্গাপুর থানা কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে সমিতির সদস্যগণ তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার তাগিদে, উপ-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী মহোদয়ের ২৫/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখের ১৬৮ নম্বর আদেশে সমিতিটি নিবন্ধনের আওতায় সমবায়ের পতাকা তলে আসে। কালের বিবর্তনে সমিতিটির উত্তরোত্তর সফলতার পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুর শাহাদতপরবর্তী বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। সমিতিটি একটি সম্ভাবনাময় সমবায় সমিতি, যথার্থ পরিচর্যার অভাবে, ব্যবস্থাপনা কমিটির অব্যবস্থাপনার ফলে দীর্ঘদিন যাবত রুগ্নাবস্থায় পড়েছিল। পুঠিয়া-দুর্গাপুর কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় শতাধিককালের যেসব

প্রতিবন্ধকতা তথা বাধার সম্মুখীন হয়েছে তার কিছু কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

(ক) পউবোভুক্ত আইআরডিবি বর্তমানে বিআরডিবি গঠনের পর বিআরডিবি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এবং বিভাগীয় সমবায় সমিতি লিঃ তথা সমবায় ব্যাংক লিঃ এর মাঝে বিদ্যমান প্রতিযোগিতায় সমবায় সমিতিটি পিছিয়ে পড়ে;

(খ) সমিতির শুরুর দিকে যথেষ্ট উন্নয়ন করলেও বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বরণ পরবর্তী সময়কালে আশানুরূপ সহযোগিতা প্রাপ্তির অভাবে সমিতিটি পিছিয়ে পড়ে;

(গ) বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইন-১৯৪০, সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ-১৯৮৪, সমবায় সমিতি আইন-২০০১, সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪, সমবায় সমিতি সংশোধন আইন-২০০২ ও ২০১৩ প্রবর্তন হলেও তৎকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক তা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা ও অব্যবস্থাপনার ফলে সমবায় সমিতিটি পিছিয়ে পড়ে;

সমিতির উন্নয়নে সম্পাদক জনাব তবারক হোসেন এর ব্যক্তিগত অবদান

জনাব মোঃ তবারক হোসেন ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সম্পাদক হিসেবে নিজ দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে বঙ্গবন্ধুর দর্শন মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির আদর্শে সমিতিটি তিনি পরিচালিত করে থাকেন এবং সমবায় সমিতিটি উন্নয়নের পথে চলতে থাকে। আকস্মিক বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বরণ পরবর্তী সময়কালে সমিতির কার্যক্রমে গতিশীলতা হারায় এই সমবায় প্রতিষ্ঠানটি। জনাব তবারক হোসেন দফায় দফায় সম্পাদক পদে বহাল থেকে তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে এই সমবায় সমিতিটিকে নিজ অস্তিত্ব বিকাশে বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পার হতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন বিধায়, অন্তর্ভুক্ত ৩০টি প্রাথমিক সদস্য সমিতির ৬০০ জন সদস্য নিয়ে পুঠিয়া উপজেলায় পুঠিয়া-দুর্গাপুর থানা কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতিটি তার উন্নয়নের পথে বহমান রয়েছে আজও।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি

অত্র সমিতির নামে পুঠিয়া মৌজার চারানি বাজারে মোট ০.১৭ শতক জমিসহ ঘর রয়েছে। সমিতির উষালগ্নে জমি ঘরের মূল্য ৬,১১৪/৫০ টাকা ছিল জানা যায়। বর্তমানে বাজার মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষাধিক টাকা। বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী জমির সঠিক মূল্য পুনঃ নির্ধারণ করার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা/দৃশ্যমান অবদান

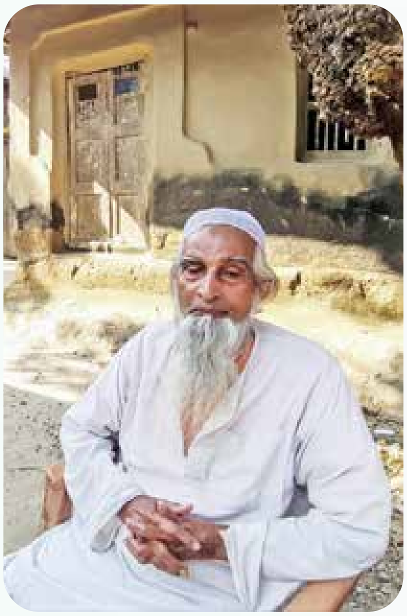

জনাব মোঃ তবারক হোসেন, সম্পাদক, পুঠিয়া-দুর্গাপুর থানা কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, পুঠিয়া, রাজশাহী। ১৯৬৮ খ্রি. হতে দফায় দফায় তিনি সম্পাদক পদে বহাল আছেন।

৩০/৬/২০২১ খ্রি. তারিখে শেয়ার মূলধন এর পরিমাণ ৯,৫৩৬ টাকা রয়েছে। সমিতির ৩০/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে মোট সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৭,২৪১ টাকা রয়েছে। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে কার্যকরী মূলধনের পরিমান ৫৫,৩১৮ টাকা। এছাড়া ৩৭,১৪৫ হিসাবে বিনিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি বা অন্য কোনো সংস্থা হতে কোনো ধরনের ঋণ গ্রহণ করেনি।

বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত

সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক, বিশেষ সাধারণ সভা যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৭/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে অত্র সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২০১৯-২০২০ অডিট বর্ষে মোট ১২টি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্বাচন : অত্র সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা ৬ জন। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ১৯/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে নির্বাচিত। সমিতির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে। উক্ত কমিটির মেয়াদ ১৮/০৫/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত বলবৎ আছে।

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক বনায়ন, গণশিক্ষা, স্যানিটেশন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল, রাস্তাঘাট মেরামত, দুস্থদের আর্থিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি সেবামূলক কাজ সমিতিতে চালু রয়েছে।

দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও জনহিতকর কার্যক্রম

গণশিক্ষা, সামাজিক বনায়ন, স্যানিটেশন কার্যক্রম এবং পরিবেশ সংরক্ষণ, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক বিরোধী প্রচারণা, টিকা দান, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি জনহিতকর কার্যক্রম চালু রয়েছে।

সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীলকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য সমিতির অনেক সদস্যকে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সময়ে সময়ে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সমিতির সদস্যদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় দিবস যথাযথভাবে পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

সামাজিক কাযর্ক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, শিশুদের টিকাদানের উদ্বুদ্ধকরণ, আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল গমনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হয়ে থাকে।

পরিণাম

বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে সমবায় সমিতিটি আজ সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। সেদিন দূরে নয় যেদিন সমিতিটি দেশের মডেল সমবায় সমিতির পাশে নিজেদের মেলে ধরতে পারবে তথা সমবায় অঙ্গনে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মাঝে নিজেদের স্বাক্ষর বহন করতে পারবে। উন্নয়নের চলমান এ ধারা ধরে রাখতে ব্যবস্থাপনা কমিটির যোগ্য লীডারবৃন্দ মূলধন বৃদ্ধি ও তার সঠিক বিনিয়োগসহ অন্তর্ভুক্ত ৩০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির ৬০০ জন ব্যক্তি সদস্যকে দক্ষ করে তুলতে, সঠিক কাজে লাগাতে, জনশক্তিতে রূপান্তর করতে তথা সমবায় সমিতিটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

মোঃ নাসির উদ্দীন : সহকারী প্রশিক্ষক, জেলা সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী।

আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, নওগাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা

একজন সমবায়ীর সমবায় ভ্রমণ

সিফাত-ই-নুসরাত

যারিন ও যুনাইরা আমাদের দুই কন্যা। ওদের বয়সের ব্যবধান ১৬ মাস আর বড়টির বয়স তখন সাড়ে তিনের মতো। সবাই মিলে মুক্ত কোনো জায়গায় যাব ভেবেছিলাম। প্রায় ৬ একর জায়গার একটি সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নওগাঁতেই আছে। ভাবলাম ঘুরে আসি। অন্তত একটু মুক্ত বাতাসে প্রাণ জুড়ানো যাবে আর বাচ্চারাও খুশি হবে। তাছাড়া আমি নিজেও একজন সমবায়ী। কোথায় আমাদের নারী সমবায়ীরা প্রশিক্ষণ নেয়, কেমন সেখানে সুযোগ সুবিধা তা দেখার ইচ্ছে ছিল ষোলো আনা। কিন্তু সেখানে এত কিছু পাব, তা আগে ভাবিনি।

গেটের সামনে নামতেই দেখি গেছে লেখা, 'শিশুস্বর্গ'। পরে শুনি এর পুরো জায়গা ঘিরেই শিশুদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হিসেবে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কি দারুন ব্যাপার! শুনতেই মন ভরে যায়। শিশুদের জন্যে নিরাপদ খেলার পৃথিবী! যার জন্যে যুদ্ধ করেছে সুকান্ত। আসলেই তো, শিশুরা ফুল। আবার ভবিষ্যতের কাণ্ডারি। ওদের জন্যে অবশ্যই আমাদের ভাবতে হবে নিরাপদ ও প্রকৃতি থেকে শিক্ষার মনোরম উন্মুক্ত বিদ্যালয়। আমি বলছি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁর কথা। যখন ভিতরে ঢুকলাম, আমার বাচ্চা দুইটা হারিয়ে গেল আনন্দে। চারপাশে ফুল আর ফুলের বাগান। সবুজ প্রান্তর। যে আমরা বাচ্চাদের চোখের আড়াল করতে চাই না এক বিন্দু সময়ের জন্য, সেই আমরাই চাইলাম যারিন যুনাইরা আজ হারিয়েই যাক। ফুলের সাথে মিলে মিলে বর্ণ শিখুক, প্রজাপতির পিছনে ঘুরে জীবনের দৌড় শিখুক, বইয়ের বাইরে কাঠবিড়ালী যে আসলে একটি সুন্দরতম প্রাণী, তা জানুক।

একজন সমবায়ী হিসেবে আমরা প্রথমেই চাই, সবুজ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রশিক্ষণ নিতে। পরিবেশ সুন্দর হলে প্রশিক্ষণে স্ফুর্তিতা আসে। পরে শুনলাম, এখানে রয়েছে দারুণ এক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা। এখানে সমবায়ীদের জন্য রয়েছে রিসিপশনের ব্যবস্থা। আছে হোস্টেলে সুন্দর আবাসন ব্যবস্থা। প্রতিটি রুমে পরিপাটি করে গার্ডেন গ্রিন রং করা। পর্দার সংযোগ হোস্টেল সুবিধাকে আরো লিভাবল করে তুলেছে। তবে এখানে যদি ফ্যানের সংখ্যাগুলো আরো বাড়ানো যেতো!

একটি সাজানো বাগান যেমন হয়,

তেমনি করেই এখানে সৌন্দর্যের পসরা সাজানো হয়েছে; যেখানে আছে গোলাপ বাগান, চন্দ্রমল্লিকা, অলোকানন্দার সারি, বাগান বিলাস, বাসর লতা, রজনীগন্ধা, অপরাজিতার নীল, স্থলপদ্ম আরো কত কি! আছে সবুজতার বেষ্টনী (হেজ), পুকুর পাড়ে বসার জায়গা, শরষে ক্ষেতে পাখির কলতান। গাছে রং করে যেন তাদের শাড়ি পরিয়ে সাজানো হয়েছে। বিল্ডিং নতুন রং পেয়েছে। এখানে কোথাও নেই সামান্য এতটুকু টিস্যু-ময়লা-পলিথিন। শুনেছি এই ক্যাম্পাসকে ধুমপানমুক্ত ও পলিথিনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে এক বছর আগেই। ক্যাম্পাসের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কৌশল জেনে আপ্লুত হলাম। এখানে পৌরসভার ওপর নির্ভর না থেকে সপ্তাহে দুইদিন নিজের চারপাশটা পরিষ্কার করে সবাই মিলে, ঠিক উগান্ডার Weyonje (do yourself) কর্মসূচির মতো। সকলের সমবেত প্রচেষ্টার এই পদ্ধতি অনুসরণ করে উগান্ডা আফ্রিকার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে শুনেছি। সরকারের উচিত, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁর মতো যারা নতুন নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিবেশের সুস্থতা বজায় করেছে, তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সম্মাননা জানানো। এতে আরো আরো প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তি-সমষ্টি অনুপ্রাণিত হবে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

এখানে, পুরা ক্যাম্পাসের সকল কর্মকাণ্ডই যেন সমবায়ভিত্তিক; যেন এখানে সমবায়ী পরিচয় কারো কোনো পরিচয় থাকতে নেই। ডাইনিং রুমে সবাই যার যার প্লেট নিজ দায়িত্বে পরিষ্কার করে রাখে। এটা একটা দারুণ উদ্যোগ। সকলের সমবেত অংশগ্রহণে অনেক বড় ও কষ্টকর কাজটাও যে সহজে হয়ে যায়, তার একটি অনুকরণীয় উদাহরণ এটি। ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবনের ছাদে সুন্দর করে একটি আইজিএ প্রশিক্ষণ রুম, স্টোর রুম, একটি সুসজ্জিত আলোকিত লাইব্রেরি, চা-চক্রে বসার মতো জায়গা, ছাদের উন্মুক্ত জায়গায় মন ভুলানো ফুলের বাগান করা হয়েছে। এই ছাদে বসে চারপাশের সবুজ প্রকৃতি, ভবনের সামনে 'সমবায়কুঞ্জ' নামে সুন্দর ফুলের বাগান, ২২ প্রজাতির আমগাছ সজ্জিত বাগান, পুকুরের অপরূপ দৃশ্য, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, শিল্পকর্ম 'জয়িতার চাকা' 'ক্ষত'; কতসব দৃষ্টিনন্দন কাজ যেন চোখ ও মনের প্রশান্তি এনে দেয়।

বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ও শিল্পকর্ম 'জয়িতার চাকা'র মুখোমুখি দৃশ্য দেখে মনে হয়, 'হে জাতিরপিতা! এই দেখ, আমরা আজ পরাধীন নই। আমরা সমবায় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জয়িতা হতে শিখেছি। সাইকেলের দুইটি পায়ের একটির মতো আমরাও সমাজের জন্য অপরিহার্য। আমরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি। তোমার স্বপ্ন পূরন হবেই হে জাতিরপিতা।'

শুনেছি শিল্পকর্ম 'ক্ষত' এর মুল প্রতিপাদ্যে তুলে ধরা হয়েছে জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, যাদেরকে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে পাক হানাদার পশুরা নির্মমভাবে খুন করেছিল। সত্যিই তো, তাদের প্রয়ান আমাদের জাতির জন্যে অপূরণীয় ক্ষত। এই ক্ষত না হলে নিশ্চিতভাবেই আমরা আরো অনেক আগে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে পারতাম শহিদ বুদ্ধিজীবীগণের শানিত মেধার উন্নয়ন ভাবনার কারণে।

একটা জিনিস ভাবছি, এই প্রতিষ্ঠান যেন পরতে পরতে ছড়িয়ে রেখেছে যেন শিক্ষার কত কত উপকরণ। শিশুদের জন্য যেন খোলা বিদ্যালয়। সবার জন্যই যেন মহাবিদ্যালয়। একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেন এমনই হওয়া উচিত।

শুনলাম, এই ক্যাম্পাসকে ঘিরে আরো আরো উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা। এখানে দুইটি পুকুর ও একটি লেক আছে। সে লেকে ড্রাম ব্রিজ করা হবে। পদ্মফুলের সুন্দর লেক করা হবে, যার নাম রাখা হয়েছে পদ্মপুকুর। পদ্মপুকুরের পাড়ে উঁচু টিবিতে করা হবে 'বকুলতলা'। উঁচু টিবিতে বকুল ফুলের গাছ দেখলাম। সেদিন হয়তো খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন এই বকুল গাছের বকুল ফুলের সুগন্ধে সুরভিত হবে ক্যাম্পাসের চারপাশ। দেখলাম ঘুরে ঘুরে এই ৬ একর ভুমির প্রায় সকল সৌন্দর্য। কত কত ফুলের গাছ! কত কত ফলের গাছ! জানলাম, পুরা ক্যাম্পাস ঘিরে রয়েছে ল্যান্ডস্কেপিং এর লম্বা পরিকল্পনা (তিন বছর মেয়াদি)। এর সাথে রাস্তা নেটওয়ার্ক, সমবায় কুঠির, তাঁবুর গেস্ট রুম, ফিশিং ফ্যাসিলিটি প্রভৃতি। এখানে প্রশিক্ষণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হবে প্রদর্শনী সেড/প্লট। যেমন : মৎস্যচাষ শিখাতে প্রদর্শনী মৎস্যচাষ পুকুর, গবাদি পশুর লালনপালন শেখাতে সেড ইত্যাদি।

সব দেখে মনে হলো এটি একদিকে যেমন জনগণের একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র, তেমনি অন্যদিকে শিশুদের জন্য একটি বিনোদন উদ্যান হতে পারে। শহরে শহরে শিশুদের উপযোগী বিনোদনকেন্দ্রের যে অভাব! বাব্বাহ! এটি মা মাত্রই হাড়ে হাড়ে সবাই টের পায়।

সমবায়ের যেমন সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে; মনে হলো তেমন করে যদি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও নিজ নিজ অফিসচত্বরকে শিশুদের জন্য আনন্দ ও বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে শিশুদের নরম মনে দেশপ্রেম, পারস্পরিক ভালোবাসা গ্রোথিত হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। পাশাপাশি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁর জন্য কিছু পরামর্শ তুলে ধরা যেতে পারে।

ক) এখানে নারী সমবায়ীদের জন্যে অনেক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। যেমন : ব্লক-বাটিক, টেইলরিং, সূচিকর্ম, ক্রিস্টাল শোপিস ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপন্ন পণ্য প্রদর্শন করার পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করার জন্য একটি ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে।

খ) অনেক নারী সমবায়ীগণ দূরদুরান্ত থেকে এই প্রশিক্ষণ সেন্টারে প্রশিক্ষণের জন্য আসে। অনেকসময় আগ্রহ থাকার পরেও ছোট ছোট বাচ্চা রেখে প্রশিক্ষণে আসতে পারে না। আগ্রহী নারী প্রশিক্ষণার্থীগণের কথা বিবেচনা করে তারা যেন বাচ্চা নিয়েই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং বাচ্চাদের জন্য একটি ডে-কেয়ার রুম স্থাপন করা যায় কি না, তা ভেবে দেখা যেতে পারে। মেয়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষা নিয়ে অতিরিক্ত সেশন রাখা যায় কি না, তা ভেবে দেখার অনুরোধ করছি।

গ) ক্যাম্পাসের নান্দনিকতা মোটেও কম না। তবে এর সাথে বিশিষ্ট সমবায়ীগণের সমবায় অঙ্গণে অবদানের কথা স্বীকার করে একটি কোলাজ ও ঝরনা স্থাপনা করা যায় কি না, তা ভেবে দেখার অনুরোধ করব। ফুলের বাগানে কিংবা বর্তমানে খেলার মাঠে একটি দোলনা ও চা-চক্রের স্থাপনা স্থাপন করা যেতে পারে।

শেষকথা বলতে হলে বলতে হয়, কথায় না বড় হয়ে আমাদের কাজে বড় হতে হবে এবং এটাই কাম্য। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ দেখার পর মনে হলো, নীরবে নিভৃতে কিছু সরকারি কর্মচারী দেশের কথা ভাবে, চারপাশের পরিবেশের কথা ভাবে, দেশের ইতিহাসকে তুলে ধরার কথা ভাবে; দেশের ভবিষ্যৎ অনাগত প্রজন্মের কথা ভাবে। চাকরিকে একটি রুটিন দায়িত্ব মনে করে না। সেজন্যই এই ক্যাম্পাসকে মনে হলো এটি শিশুদের জন্য একটি বিনোদন কেন্দ্র, একটি বিদ্যালয়ের মতো। আগেই বলেছি, সরকারি দপ্তরের সামাজিক দায়বদ্ধতাও থাকা দরকার। দেশের কত কত কৃষিজমি নিয়ে কত কত সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে! এদের উচিত জমির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অন্তত শিশুদের জন্য, অনাগত প্রজন্মের জন্য শিক্ষামূলক-বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তুলে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করা। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। জয় হোক সমবায়ী প্রচেষ্টার।

সিফাত-ই-নুসরাত : সদস্য, আগামী সরকারি কর্মচারী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা ও সহকারী অধ্যাপক, সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া

অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রাপ্ত সমবায়ী ও সমবায় সমিতির প্রতিনিধিগণের সঙ্গে প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০20 প্রদান অনুষ্ঠান

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষে ৬ নভেম্বর' ২০২১ তারিখে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি বলেছেন, সমবায় ব্যবস্থাপনাকে মর্যাদার আসনে নিতে হলে দেশের সকল সমবায় সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি, এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি। অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস ও জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি শেখ নাদির হোসেন লিপু উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি বলেন, সমবায় ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হলে সমবায়ের দূর্বলতা ও অসামঞ্জস্যতা দূর করতে হবে। প্রয়োজনে আইনে সংশোধনী আনতে হলে সেটাও করতে হবে। সমবায়ের সুফল কাজে লাগিয়ে দেশের ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন শুধু সমবায় ব্যবস্থাপনয়ে নয়, সকল প্রতিষ্ঠান এমন কি ব্যক্তি পর্যায়েও মানুষের মধ্যে স্বচ্ছতা

বেলুন উড়িয়ে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি ও নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি

ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। তাহলে কাজের পরিধি ও মান বাড়বে।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে স্বাধীনতার পর দেশ গঠনের লক্ষ্যে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন—যার মধ্যে অন্যতম একটি হলো সমবায় ব্যবস্থাপনা। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন গ্রামীণ মানুষের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে সমবায়ের বিকল্প নাই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, জাতির পিতা চেয়েছিলেন গ্রামভিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে সম্মিলিতি উদ্যোগকে জনগণের উন্নয়নে কাজে লাগাতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও অনুরূপভাবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিদের জীবনমান উন্নয়নে সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত সমবায়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

পুরস্কারপ্রাপ্ত সমবায়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

অনুষ্ঠানে ‘বঙ্গবন্ধু ও সমবায় একটি ঐতিহ্য অনুসন্ধান’ এবং ‘নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার : প্রসঙ্গ সমবায়’ শীর্ষক দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন আমন্ত্রিত অতিথিগণ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি শেখ নাদির হোসেন লিপু।

এছাড়াও সারাদেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসবমুখর পরিবেশে ৫০তম জাতীয় দিবস পালন করা হয়।

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত রংপুর বিভাগের র‍্যালি

রংপুরে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২১ উদযাপন

'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রি., শনিবার, ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস, ২০২১ সারাদেশের ন্যায় রংপুর বিভাগেও যথাযোগ্য মর্যাদায় উৎসবমুখর পরিবেশে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও জাঁকজমকভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সকাল ০৯:৪৫ টায় শহরের টাউন হলে সকল সমবায়ী সমবেত হন এবং সকাল ১০:০০ টায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি সংঘটিত হয় (টাউন হল প্রাঙ্গণ হতে রংপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক হয়ে টাউন হল)। মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ ও সভাপতি মহোদয় এর উপস্থিতিতে টাউন হল প্রাঙ্গণে সকাল ১০:৩০ টায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঁঞা, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব দেবদাস ভট্টাচার্য্য বিপিএম, ডিআইজি, রংপুর রেঞ্জ, রংপুর; জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম, পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর; জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর; জনাব মুহাঃ শাহীনুর ইসলাম, অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, রংপুর ও জনাব তুষার কান্তি মণ্ডল, সভাপতি, রংপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ ও রংপুর সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ, রংপুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রংপুর।

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবসে রংপুর বিভাগের আলোচনা সভা

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণের পর তাঁদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। পরবর্তীতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও গীতা পাঠ শেষে সকলের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মুহাঃ শাহীনুর ইসলাম, অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, রংপুর। এরপর জেলার সমবায় কার্যক্রমের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। উক্ত ভিডিও ডকুমেন্টারি দেখে সকলে খুবই মুগ্ধ হন এবং এ জেলার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। সমবায়ীদের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সমবায়ী ইঞ্জি. জনাব মুহম্মদ ওয়াদিল প্রামাণিক, সভাপতি, কৃষি বাড়ী রংপুর কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এবং জনাব সাঈদ মামুনুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, কাণ্ডারি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ রংপুর। এরপর বিশেষ অতিথিবৃন্দ ও প্রধান অতিথি তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য প্রদান করেন। অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে জেলার সমবায় কার্যক্রমের সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক সিডিএফ প্রদানকারী বিভাগীয় পর্যায়ে ৩টি, জেলা পর্যায়ে ৩টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৭টিসহ সর্বমোট ১৩টি প্রাথমিক সমবায় সমিতিকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা। পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

'সুবর্ণ রেখায় বাংলাদেশ : স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের সমবায় ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় আগামী দিনের সমবায় ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার

'সুবর্ণ রেখায় বাংলাদেশ : স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের সমবায় ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় আগামী দিনের সমবায় ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার

মোঃ সাইফুল ইসলাম

১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে আগারগাঁওস্থ সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় ভবনে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে 'সুবর্ণরেখায় বাংলাদেশ : স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের সমবায় ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় আগামী দিনের সমবায় ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস স্বাগত বক্তব্যে বলেন, এ উপমহাদেশে সমবায় শতবর্ষের অধিককাল অতিক্রম করলেও বাংলাদেশে স্বাধীনতার ৫০ বছরে সমবায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তিনি 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও সমবায়ে উন্নয়ন' এ বিষয়ে কৃষি সমবায় থেকে শুরু করে সমবায়ের নানা ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা, চেতনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার আলোকে সমবায় অধিদপ্তর 'বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ পাইলট প্রকল্পের কাযক্রম শুরু করেছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স) জনাব মোঃ আহসান কবীর।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

'সুবর্ণ রেখায় বাংলাদেশ : স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের সমবায় ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় আগামী দিনের সমবায় ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ

সেমিনারে মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন মুখ্য আলোচক ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ, বরিশাল এর সাবেক উপাচার্য ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আমলে কৃষকদেরকে কৃষিপণ্যের উপকরণে ভর্তুকিমূল্য প্রদান করা হতো। বর্তমানে ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা অনেক বেশি। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্য বিতরণ করলে সহজেই অনেকের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা যায়। তিনি বলেন, চীনে শতকরা ৭৫ভাগ কৃষিঋণ দিয়ে থাকে সমবায়। যেখানে গণতন্ত্র ও সমবায় থাকে সেখানে স্বচ্ছতা থাকে। পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রধান অবলম্বন হতে পারে সমবায়। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সমবায়ের মাধ্যমে সম্ভব। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে সমবায়ের দরকার।

সেমিনারে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মিজানুল হক কাজল বলেন, পরিবেশ ও বর্জ্য ব্যবস্থানার ক্ষেত্রে সমবায় একটি ভালো পদ্ধতি হিসেবে কাজ করতে পারে। অধিকন্তু বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সমবায় পদ্ধতি ফলপ্রসু হতে পারে।

তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কৃষির আধুনিকায়নে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সরকার ৫০%-৭০% ভর্তুকি দিচ্ছে। ২৭ লক্ষ টাকার হারভেস্টার ১৪ লক্ষ টাকায় দিচ্ছে। হাব গড়ে তুলতে পারলে সমবায়ের মাধ্যমে সেবা পাওয়া সহজ হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সমবায় মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবেশ রক্ষা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমবায় কাজ করতে পারে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়ের একটি ভালো সিস্টেম থাকা দরকার। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে শক্তিশালী করতে পারলে আর্থিক বিষয়ের সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। এটি আর্থিক বিভাগের অধীনে গেলে সমবায়ের চরিত্র ধরে রাখা যাবে না। তিনি বলেন, মডার্ন এপ্রোচ হলো সমস্যা থাকবে সমাধান বের করতে হবে। বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ প্রকল্পে সার্বিক কম্পোনেন্ট আছে। প্ল্যানিং উইংকে আপডেট করতে হবে। তিনি বলেন, ড. জাহাঙ্গীর তাঁর বক্তব্যে সমবায়ের সাফল্য তুলে ধরেছেন এ থেকে আমরা উদ্বুদ্ধ হতে পারি। আমাদেরকে ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্খা, মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। তাহলে আমরা কাজগুলো করতে পারবো। তিনি বলেন, সময়ের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে নাই সমবায়। খাপ খাওয়ানোর জন্য দরকার পরিবর্তনের। তিনি বলেন, কোডাক সময়ের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলে এ্যাবোলিশ হয়ে গেছে। পরিবর্তন আনতে হবে, পরিবর্তিত হতে হবে।

তিনি বলেন, সিলেট বিভাগে প্রচুর অনাবাদী কৃষি জমি পড়ে থাকে। তবে কাউকে চাষাবাদ করতে দিলে জমি হাতছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়ে ফসলি জমি অনাবাদী পড়ে থাকে। প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকায় রেমিট্যান্স আসে, বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রবাসীরা ল্যান্ড বিক্রি করে টাকা নিয়ে যায়। সমবায়ের মাধ্যমে সিলেটের জমি চাষাবাদ করতে কেউ এগিয়ে আসলে সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সমবায়ের সামঞ্জস্য রেখে মডেল নিয়ে আসলে সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য করতে পরেবো। তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। যুগোপযোগী প্রোজেক্ট তৈরি করতে হবে। সময়োপযোগী প্রোজেক্ট তৈরি করতে মার্কেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের ভাবনাগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মূল প্রবন্ধের ওপর আরও আলোচনা করেন সমবায় অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত নিবন্ধক ও ইউএনডিপি'র কনসালট্যান্ট জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মোমিনুল হক তালুকদার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সমবায়ী জনাব জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, বার্ডের পরিচালক জনাব রঞ্জন কুমার ভৌমিক, বিআরডিবি 'র যুগ্ম পরিচালক জনাব সুকুমার চন্দ্র প্রমুখ।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'অমর একুশে বইমেলা-২০২২' এর উদ্বোধন করেছেন। 'বইমেলা বাঙালির প্রাণের মেলা' উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বইমেলা শুধু বইমেলা নয়, সকলের মিলনমেলা।'সারাদেশে সংস্কৃতিচর্চা আরো বাড়ানোর পাশাপাশি সকলকে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বানও পুণর্ব্যক্ত করেন তিনি। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে রাজধানীর বাংলা একাডেমির মেলা প্রাঙ্গণে সংযুক্ত হয়ে ভার্চুয়ালি মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

অমর একুশে বইমেলা ২০২২

বইমেলায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ হোসেন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মো. মশিউর রহমান, এনডিসি, বাংলা একাডেমির সচিব (যুগ্ম সচিব) জনাব এ. এইচ. এম. লোকমান, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস, সারাদেশের সমবায়ী, সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা -কর্মচারি এবং সাধারণ মানুষ ও পাঠক সমবায় অধিদপ্তরের এ স্টল পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন বহিতে সমবায়ের স্টল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ এবং ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রায় সাড়ে ৭ লাখ বর্গফুট জায়গায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেলায় মোট ৩৫টি প্যাভিলিয়নসহ একাডেমি প্রাঙ্গণে ১০২টি প্রতিষ্ঠানকে ১৪২টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে ৪৩২টি প্রতিষ্ঠানকে ৬৩৪টি ইউনিটসহ মোট ৫৩৪টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৭৬টি ইউনিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এবারের বইমেলায় সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'সমবায় অধিদপ্তর' অংশগ্রহণ করছে। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণের ৬৭৭ ও ৬৭৮ দুটি ইউনিট নিয়ে সমবায় অধিদপ্তরের নান্দনিক সুদৃশ্য স্টল নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্টলে সমবায় বিষয়ক বিভিন্ন বই— আইনের বিধিবিধান সম্পর্কিত পুস্তকাদি, সমবায়ের সাফল্য গাথা, নারী উন্নয়নে শেখ হাসিনার সরকার : প্রসঙ্গ সমবায়, বঙ্গবন্ধু ও সমবায় একটি ঐতিহ্য অনুসন্ধান শীর্ষক প্রকাশনাসমূহ এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা 'সমবায় পত্রিকা বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হয়।

বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জনাব কে. এম. খালিদ। এ সময় মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে সমবায় অধিদপ্তরের প্রকাশনা 'বঙ্গবন্ধু ও সমবায় : একটি ঐতিহ্য অনুসন্ধান'—গবেষণা গ্রন্থটি সৌজন্য উপহার প্রদান করা হয়।

সমবায় অধিদপ্তরের প্রকাশনা নিয়ে চ্যানেল আইকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের ব্রিফিং

বাঙালি জাতিসত্বা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টলে নীতিপ্রণেতা, উন্নয়নকর্মী, সমবায়ী, গবেষক, ছাত্র ও আগ্রহীদের সমবায় সম্পর্কে জানার অপরিমেয় সুযোগ রয়েছে। বিগত ৮ মার্চ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সমবায় অধিদপ্তরের বুকস্টল পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল 'চ্যানেল আই'কে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকাশনা সম্পর্কে ব্রিফিং করেন।

বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

ফাগুনের বিকেলবেলা, মন রাঙালো বইমেলা

গত ১৫ ফাল্গুনের বিকেলটা বইমেলায় আনন্দ-আড্ডায় মুখরিত হয়ে উঠে। এ প্রাণবন্ত সান্নিধ্যের মধ্যমনি ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। তন্মধ্যে একটি সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক কবি খোন্দকার হুমায়ূন কবীরের ছড়াগ্রন্থ 'বাবার জন্য ভালোবাসা'। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বিশিষ্ট অভিনেতা ডি এ তায়েব, বরিশাল জেলা সমিতির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

মোড়ক উন্মোচন শেষে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয় এবং অতিথিবৃন্দ সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করেন। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের নিউজ কাভারেজ করে জনপ্রিয় টি ভি চ্যানেল 'চ্যানেল আই'।

অমর একুশে বইমেলায় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়ের সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করেন।

সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন খ্যাতিমান ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস ও তুষার ইমরান। এসময় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক তাদেরকে সমবায় অধিদপ্তরের প্রকাশনা ‘বঙ্গবন্ধু ও সমবায় : একটি ঐতিহ্য অনুসন্ধান ‘ এবং বইমেলা উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের গিফট হ্যাম্পার সৌজন্য উপহার প্রদান করেন।

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস ও তাঁর মেয়ে বাংলা একাডেমিতে সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করছেন।

৫ মার্চ ২০২২ তারিখে বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা-২০২২ এ সমবায় অধিদপ্তরের স্টলে জনাব সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু, উপসচিব (সমবায় প্রশাসন), পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগ, জনাব মোহাম্মদ মিকাইল, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক (প্রশাসন) জনাব রিক্তা দত্ত ও যুগ্ম নিবন্ধক জনাব রাশিদা মোস্তারিন।

‘অমর একুশে বইমেলা-২০২২’-এ বাংলা একাডেমির সচিব জনাব এ. এইচ. এম. লোকমানকে সমবায় অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত ‘বঙ্গবন্ধু ও সমবায় : একটি ঐতিহ্য অনুসন্ধান’ গবেষণা গ্রন্থটি উপহার দেন সমবায় অধিদপ্তরের উপ নিবন্ধক (প্রশাসন) জনাব নূর মোহাম্মদ মামুন

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলা একাডেমী আয়োজিত ‘অমর একুশে বইমেলা-২০২২’ এ সমবায় অধিদপ্তরের স্টল উদ্বোধনকালে এটিএন নিউজ-এর সাথে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মো. আহসান কবীর।

বিজয় দিবসে শপথ করালেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের মানুষকে শপথবাক্য পাঠ করালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ বিজয়ের ৫০ বছর ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে 'মহাবিজয়ের মহানায়ক' শিরোনামে বিশেষ অনুষ্ঠানে বিকেল সাড়ে ৪টায় এই শপথ বাক্য পাঠ করান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের নিম্নোক্ত শপথটি পাঠ করান-

'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বিশ্বের বুকে বাঙালি জাতি প্রতিষ্ঠা করেছে তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তা।

আজ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিববর্ষের বিজয় দিবসে দৃপ্তকণ্ঠে শপথ করছি যে, শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না- দেশকে ভালোবাসবো, দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শে উন্নত, সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সোনার বাংলা গড়ে তুলবো।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।'

শপথ অনুষ্ঠানের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী প্রবেশের পরপরই জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেশের ৮ বিভাগের বিভাগীয় জেলা, জেলা ও উপজেলা স্টেডিয়াম ও বিজয় দিবসের নির্ধারিত ভেন্যু থেকে সাধারণ মানুষ জাতীয় পতাকা হাতে শপথ বাক্য পাঠ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তার ছোট বোন শেখ রেহানা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঞ্চালনায় শপথ পাঠ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

বিজয় দিবসের 'শপথ অনুষ্ঠান'-এ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরে অংশ গ্রহণ করেন সমবায় কর্মকতা ও কর্মচারীবৃন্দ

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে কেক কাটেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

সমবায় অধিদপ্তরে জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ পালন

১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষে প্রত্যুষে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে এবং সমবায় অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস ও অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ। পরে সমবায় অধিদপ্তরে শিশুদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি বলেন যে, জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণীত, জরিপের মাধ্যমে প্রমাণীত। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে আমরা আনন্দিত, উদ্বেলিত। এদশের মানুষ বিকৃত ইতিহাস জেনেছে। সঠিক ইতিহাস না জেনে দেশ ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে। জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য স্বাধীনতার চর্চা, মুজিব চর্চার দরকার আছে। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল। সমগ্র পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬% তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এবং ৪৪% পশ্চিম পাকিস্তানের হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা ২৪ বছর এদেশ শাসন করে। এর ফলে দেশের মানুষ বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। ২৪ বছরের মধ্যে এদেশে সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর প্রধান পদে কিংবা কোনো বড় পদে এদেশের কর্মকর্তা ছিল না। বেসামরিক প্রশাসনে সচিব কিংবা সরকারি উচ্চ পদে কোনো কর্মকর্তা ছিল না। বৈষম্য, নির্যাতন থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি স্বাধীনতার মাধ্যমে। এ স্বাধীনতা এনেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সালে এদশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ২৭৮ ডলার ২০ বছরে ১৯৯৫ সালে এ আয় দাঁড়িয়েছে ৩৮২ ডলারে, ২০০৯ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৭০৯ ডলার আর বর্তমানে ২৫০৯ ডলার। বঙ্গবন্ধুর ও

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিশুদের সঙ্গে মঞ্চে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং কর্মকর্তাগণ

আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দেশের সিংহভাগ উন্নয়ন হয়েছে। স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী সরকার ক্ষমতায় থাকা দরকার। চরিত্রের মধ্যে শুদ্ধাচার আনতে না পারলে দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না। মূল্যবোধ, আদর্শ সঠিকভাবে উপলব্দি না করতে পারলে ভিন্নভাবে উপলব্দি করলে দেশ উন্নতির গতি হারাবে। সাড়ে তিন বছরে এমন কোনো মন্ত্রণালয় নেই, দপ্তর নেই যেখানে বঙ্গবন্ধু সূচনা প্রবর্তন করে দিয়ে যান নাই। বীরের সম্মান করা না হলে সেখানে বীরের জন্ম হয় না। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার পৃথক খাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এ কারণে সমবায় পরিবারে যারা চাকরি করেন বঙ্গবন্ধুর কাছে তাদের ঋণ অনেক বেশি, আমাদের মুজিব চর্চা করতে হবে। মননশীলতায় পরিবর্তৃন আনতে হবে, চেতনাবোধ আমাদের ভিতরে ধারণ করতে না পারলে উগ্রবাদীতা দুর করতে পারবো না দেশের উন্নয়ন ঘটাতে পারবো না।

সভাপতির বক্তব্যে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস বলেন, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতিরপিতাকে নিয়ে আজকের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। আজকের দিবসটি শিশুদের জন্য। শিশুরা তাদের বক্তব্যে বলেছে—কেক খেয়েছি, বঙ্গবন্ধু দেশকে ভলোবাসতেন। বঙ্গবন্ধু শিশুকে বিদেশ সফরে নিয়ে যেতেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের শুরু ১৯৪০ সালে। বঙ্গবন্ধু প্রখর মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে পটুয়াখালীর বাউফল গিয়েছিলেন। সেখানে ইউনিয়নের এক নেতার নাম জেনেছিলেন,

শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়

ঐ নেতা ঢাকায় আসার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তার নাম ধরে ডেকেছিলেন। মফস্বলের সেই নেতা আশ্চর্য হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের আগ থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছেন এবং এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সংবিধানে সমবায়ের কথা আছে, সংবিধানে সমবায়ের মালিকানা বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন। আমরা যেটা করতে পারি নাই পরবর্তী প্রজন্ম সেটা করবে। এ প্রজন্মকে যত বেশি বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতার কথা বলা হবে তারা ততবেশি সেটা ধারণ করবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব চন্দন কুমার দে বলেন, ২০৩০ সালে আমরা এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবো। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের মঙ্গলের চিন্তা মাথায় রেখে আমরা কাজ করি। আন্তর্জাতিকভাবে আমরা একটা ভালো অবস্থানে আছি। বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের যে অবস্থান তাতে বিশ্বের বুকে আমরা মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারবো। আলোচনা সভায় অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মোঃ আহসান

অনুষ্ঠানে শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) জনাব চন্দন কুমার দে

কবীরসহ সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা- কর্মচারিগণ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদেরকে এবং উপস্থিত সকল শিশুদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সচিব এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দর্শকসারিতে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিশুদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়

সমবায় অধিদপ্তরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

২৬ মার্চ ২০২২ তারিখে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি বলেন, ১৯৭১ সালে আমার বাবার চাকরির সুবাদে আমি ঝালকাঠি মহাকুমায় বসবাস করছিলাম। ঝালকাঠি একটি হিন্দু অধ্যুসিত এলাকা ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সৈন্য ও রাজাকাররা ঝালকাঠিতে যে ধরণের অত্যাচার করছে তা ছিল ভয়াবহ। ১০/১২ বছর আগেও আমি সে ভয়াবহতার দুঃস্বপ্ন দেখেছি। ঝালকাঠিতে জীবন বাঁচাতে আমরা ভাড়া বাসার মালিকের গ্রামের বাড়ীতে চলে গিয়েছিলাম। মুঘল ও বৃটিশের শাসন আমলসহ ১,০০০ বছর পেছনে গেলেও দেখা যাবে আমরা বাঙালীরা কখনো স্বাধীন ছিলাম না। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ প্রকৃতভাবে স্বাধীন হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল না, বৈষম্য ছিল। বাঙালীরা কেউ এদেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য ছিল, বৈষম্য থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সোনার বাংলা গড়ার জন্য তিনি এদেশটাকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। যে চেতনা নিয়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই চেতনা আমাদেরকে লালন করতে ও ধারণ করতে হবে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়কলে মাথাপিছু আয় ৩৮২ ডলার হয়েছিল। ২০ বছরে উন্নয়ন হয়নি। স্বাধীনতার চেতনার সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে মাথাপিছু আয়, গড় আয়, রাস্তাঘাট ইত্যাদির উন্নয়ন হয়েছে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা উজ্জীবিত রাখতে হবে। ২০৪১ সালে উন্নত বিশ্বে উন্নীত

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

করতে চাইলে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। বৈষম্য, মুক্তিযুদ্ধকালের বিভীষিকা যারা দেখেন নাই স্বাধীনতার চেতনা ধারণ করার জন্য তাদের এ ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ৩০ লক্ষ শহীদের জন্য আমাদের দায় রয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূর ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে এ দায় শোধ করতে হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সাথে, মুক্তিযুদ্ধের সাথে সমবায়ের যোগসূত্র আছে—একারণেই সমবায়ের মাধ্যমে সুজলা, সুফলা সোনার বাংলাদেশ গড়তে পারবো। আর এটা করতে পারলে স্বাধীনতা দিবসকে যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ২য়/৩য় শ্রেণিতে পড়ি, সে সময় বরিশালে আমাদের গ্রামর বাড়ির পাশের সুগন্ধা নদীতে আমি অন্তত ৫টি লাশ ভাসতে দেখেছি, মা বোনদেরকে ধরে নিয়ে গেছে এরকম ১০টি ঘটনা শুনেছি। এ উপমহাদেশের ২০০ বছরের ইতিহাসে বৃটিশরা একটি জাতি গোষ্ঠীকে বিভাজন করার বীজ বপন করে দিয়ে গেছেন। দ্বি-জাতি তত্ত্বেরভিত্তিতে পাকিস্তানকে স্বাধীন করার নায়ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইংরেজিতে কথা বলতেন, আবার তিনিই উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার কথা বলেছিলেন ইংরেজিতে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, নতুন করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার আর কি প্রয়োজন আছে? ছাত্রজীবন থেকে একজন মানুষ অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছেন, ৭ মার্চ, ৬ দফা, ২য় বিপ্লব, গণ অভ্যুত্থান, এগুলো হলো স্বাধীনতা আন্দোলনের পিলার। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা আমরা মুখস্থ করে যাই আসলে এগুলো হৃদয়াঙ্গম করতে হবে। তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' কতো জনের পড়া হয়েছে। এটি লেখা পড়া করে ধারণ করে হৃদয়ঙ্গম করলে এটি আর হারাবে না। তিনি বলেন, বিশ্বের অনেক দেশ আছে অল্প সময়ে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে। স্বাধীনতার সুফল ভোগের জন্য ৫০ বছর লাগে না। মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার সাথে সমবায়ের একটা যোগসূত্র আছে, সেটা বাস্তবায়ন করতে পারলে সমবায় অধিদপ্তর হবে একটি শীর্ষস্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান। সমবায় অধিদপ্তরে অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মোঃ আহসান কবীর বলেন, বাঙালি জাতির মহৎ অর্জন স্বাধীনতা, গর্বের বিষয় হলো মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। রাজনৈতিক শিষ্টাচার এ ভাষণের মধ্যে আছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনুযায়ী বাংলাদেশ কিভাবে চলবে সেটা হলো চার মূলনীতি। তিনি বলেন, সমবায় সম্পর্কিত তাঁর ভাষণে তিনি বলেছেন 'উন্নত জীবনের অধিকারী হবে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কোঅপারেটিভ গড়ে তুলতে হবে।....গণমুখী সমবায়ের কথা বলেছেন।' সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এগুলো সমবায় অধিদপ্তরের ঐতিহাসিক দায়। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর দর্শন বাস্তবায়ন করতে পারলে বঙ্গবন্ধুকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। সভায় সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ বক্তব্য রাখেন। সভায় সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন।

বরিশাল বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বরিশাল বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন র মা। তাঁর পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং তাঁর বড় ভাই।

বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতির উদ্বুদ্ধকরণ সভা

বরিশাল জেলার মুলাদী উপজলায় চরকমিশনার গ্রামে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতি লিমিটেড'-এর উদ্বুদ্ধকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস।

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলা পরিদর্শন

"দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ" প্রকল্পের আওতায় চেক বিতরণ করছেন জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১০ মার্চ ২০২২ তারিখে যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলায় জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা; জনাব আহসান কবীর, অতিরিক্ত নিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স) সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা; জনাব মোঃ মিজানুর রহমান প্রকল্প পরিচালক, "দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ" প্রকল্প; জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, "বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প" এবং জনাব মোঃ তমিজুল ইসলাম খান, জেলা প্রশাসক, যশোর মণিরামপুর উপজেলায় চলমান প্রকল্প পরিদর্শন ও বিভিন্ন সভায় যোগদান

চেক বিতরণ করছেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

চেক বিতরণ করছেন ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

"বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প" এর উপজেলা সার্বিক সমন্বয় কমিটির সভা

করেন। এর অংশ হিসেবে "দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ" প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সমবায়ীদের মাঝে প্রত্যেককে ১,০৫,০০০ টাকার গরু ক্রয়ের চেক বিতরণ করেন। "বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প" এর উপজেলা সার্বিক সমন্বয় কমিটির সভায় যোগদান করেন এবং উক্ত প্রকল্পের আওতায় পাড়ালা গ্রামে অংশীজন সভায় অংশগ্রহণ করেন।

"বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প" এর আওতায় পাড়ালা গ্রামে অংশীজন সভা

চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা ও উপজেলা সমবায় অফিসারদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা ও উপজেলা সমবায় অফিসারদের সাথে মতবিনিময় সভা

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বিয়াম ফাউন্ডেশন, আঞ্চিলক কেন্দ্র কক্সবাজারে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন বদরখালী সমবায় ও কৃষি উপনিবেশ সমিতি কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক সমিতির চলমান বিভিন্ন সমস্যা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মোঃ আহসান কবীর, যুগ্ম নিবন্ধক জনাব মোঃ হাফিজুল হায়দার চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিভাগের যুগ্ম নিবন্ধক জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়াসহ চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জেপি দেওয়ান এবং চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব ওসমান গণি উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

কক্সবাজারের বিয়াম আঞ্চলিক ফাউন্ডেশনে চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা ও উপজেলা সমবায় অফিসারদের সাথে মতবিনিময় সভায় সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাসকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছনে জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম, এ সময় সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক (প্রশাসন, ফাইন্যান্স ও মাসউ) জনাব মোঃ আহসান কবীর উপস্থিত ছিলেন

কক্সবাজারে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

২০-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বিয়াম আঞ্চলিক ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার কর্তৃক আয়োজিত সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্সে সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-রশিদ-বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মোঃ আহসান কবীর, বিয়াম আঞ্চলিক ফাউন্ডেশন, কক্সবাজারের পরিচালক জনাব হাবিব উল্লাহ মারুফ, সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক (প্রশাসন) নূর মোহাম্মদ মামুন ও উপনিবন্ধক মো. আতিকুল ইসলাম

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

মানসম্পন্ন নিরাপদ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন' শীর্ষক কর্মশালা

৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরে 'মানসম্পন্ন নিরাপদ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন' শীর্ষক কর্মশালা'র আয়োজন করা হয়। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস কর্মশালার উদ্বোধন করে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। কি-নোট পেপার উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, যুগ্ম-নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা। কর্মশালার বিষয় ও কি-নোট পেপারের উপর পর্যালোচনামূলক বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের প্রফেসর ড. এম. আক্তারুজ্জামান ও সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক (প্রশাসন, ফাইন্যান্স ও মাসউ) জনাব মোঃ আহসান কবীর। কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন বিভাগ হতে পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ২৫ জন সমবায়ী অংশগ্রহণ করেন।

'ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস' বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২১ উপস্থিত সমিতির সদস্যরা

'ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস' বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২১ অনুষ্ঠিত

ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২১ এবং বার্ষিক বনভোজন গত ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর গাজীপুরের ঢাকা রিসোর্টে সমিতির সদস্যদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সমিতির সদস্য এবং পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে এক ভিন্ন আমেজে বারবিকিউ আড্ডা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ৩০তম বিসিএস এর বিভিন্ন ক্যাডারের ৫৭ জন কর্মকর্তাগণের একটি সামাজিক সংগঠন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত একটি সমবায় সমিতি "ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড"। ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস উচ্ছল প্রাণের মিলনমেলা বার্ষিক সাধারণ সভা, বনভোজন, বারবিকিউ আড্ডা ও পিঠা উৎসব ত্রিমাত্রিক সুহৃদ এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এক অনন্য সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। সুদৃঢ় করেছে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা। সমিতির সদস্য ও পরিবারের সদস্যগণ জানান, পেশাদারিত্বের পাশাপাশি "ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস"এর এরকম বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক মিলনমেলা আমাদের সকলের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করছে এবং নতুন উদ্যমে কাজ করবার শক্তি যোগাচ্ছে।

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডিএমপির অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ত্রিমাত্রিক-৩০ বিসিএস অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড গত ৫ বছরে নানা সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে কিন্তু এবারেই প্রথম ঢাকার বাহিরে পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করতে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে গাজীপুরের ঢাকা রিসোর্টে ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পরিবারের সদস্যদের জন্য বনভোজন, বারবিকিউ আড্ডা এবং পিঠা উৎসবের আয়োজন করেছে। সেই সাথে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির কার্যক্রম আরো পরিশীলিতভাবে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন নীতিমালা তৈরিসহ সামাজিক নানা প্রকল্প গ্রহণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অচিরেই তা বাস্তবায়নে সমিতি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

এছাড়াও সমিতির পক্ষ থেকে ঢাকা রিসোর্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয় এবং সমিতির অনুষ্ঠান সফল করতে সার্বিক সহযোগিতার জন্য রিসোর্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

SAMABAYA ● January-March 2022 ● Price Tk 25.00 ● Regd No. DA-41

‘২০২২ সাল হবে
বাংলাদেশের জন্য
অবকাঠামো উন্নয়নের এক
মাইলফলক বছর।’

–প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
৭ জানুয়ারি, ২০২২

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B,
Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 9140877 I Editor : Md. Saiful Islam